সংশোধিত সংস্করণ
মাংসাহার
ধর্ম, অর্থ আর বিজ্ঞানের আলোকে
- আচার্য্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক
অনুবাদকঃ আশীষ আর্য
প্রকাশকঃ শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস

মুখ্য দ্বার (মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বার)

মহর্ষি ব্রহ্মা অনুসন্ধান ভবন

দিনাঙ্ক ৯/১০/২০১১ তে অন্তর্রাষ্ট্রীয় খ্যাতির্লব্ধ খগোল বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আভাস কুমার মিত্রা এবং প্রখ্যাত খগোল বৈজ্ঞানিক প্রফেসর এ০ আর০ রাও অনুসন্ধান ভবনের উদ্ঘাটন করছেন

ওতম্

সংশোধিত সংস্করণ

মাংসাহার

ধর্ম, অর্থ আর বিজ্ঞানের আলোকে

লেখক

আচার্য্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক

সম্পাদক

বিশাল আর্য

(M.Sc. Theoretical Physics)

অনুবাদক

আশীষ আর্য

প্রকাশক

শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস

(বৈদিক এবং আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞান শোধ সংস্থান)

বেদ বিজ্ঞান মন্দির, ভাগলভীম, ভীনমাল জেলা-জালোর

(রাজস্থান) পিন- ৩৪৩০২৯

অনুক্রমণিকা

সম্মতি

মাননীয় ঋষিকল্প মুনি শ্রী অগ্নিব্রত জী দ্বারা রচিত 'মাংসাহার (ধর্ম, অর্থ আর বিজ্ঞানের আলোকে)' পুস্তকের আমি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেছি। আচার্য জী সকল দৃষ্টি দ্বারা মাংসাহারের মানবের জন্য অনুপযোগীতা দেখিয়েছেন আর মিস্টার ফারুক দ্বারা দেওয়া অর্ধসত্যযুক্ত তর্কের বিবেচনাত্মক খণ্ডন করে দিয়েছেন। আমি আশা করছি যে এই পুস্তককে পড়ার পর যেকোনো বুদ্ধিমান ব্যাক্তি মাংসাহার, মত্স্যাহার, ডিম্বাহার আদি অভোক্ষ্য পদার্থের কখনও সেবন করবে না। আবশ্যকতার কথা এটা হল যে এই কথাগুলো সকল বুদ্ধিমান মনুষ্য অধিক হতে অধিক প্রচার করুক আর অধিকাধিক মনুষ্যকে শুধরিয়ে শাকাহারসেবী বানানোর প্রয়াস করুক।

- আচার্য সত্যানন্দ বেদবদগীশ

মহর্ষি দয়ানন্দ স্মৃতি ভবন, জোধপুর

সম্পদকীয়

বুদ্ধি হল সেই বস্তু, যা মনুষ্যকে পশুর থেকে ভিন্ন বানায়। পরমপিতা পরমাত্মা মনুষ্যকে বিশ্বের সবথেকে বুদ্ধিমান প্রাণী বানিয়েছে। এরজন্য আমাদের উপর দায়িত্ব হয়ে যায় যে আমরা অন্য প্রাণীদের ও পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখি।পরমাত্মা মনুষ্যদের ভোজনের জন্য নানা প্রকারের ফল, দুধ, সব্জি, বাদাম আদি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যবর্ধক পদার্থ বানিয়েছে। কিন্তু নির্দয়ী মনুষ্য নিজের জিহ্বার তৃপ্তির জন্য বিভিন্ন নির্দোষ, নিরীহ প্রাণীদেরই খাওয়া প্রারম্ভ করে দেয়।

কিছু তথাকথিত প্রবুদ্ধ মহানুভাব ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা তথা বৈদিক ধর্মকে নষ্ট করার জন্য মাংসাহারের মতো পাপকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধ করার প্রয়াস করে থাকে। কেউ খাওয়ার স্বতন্ত্রতার নামে, কেউ বৈজ্ঞানিক ও আর্থিক তর্ক দিয়ে, তো কেউ এটা বলে যে আমরা যদি না খাই, তবে পশুর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে, মাংসাহারের সমর্থন করে। এইরকমই এক মহানুভব হল মোহম্মদ ফারুক খাঞ্জী, যে "দয়া ও মাংসাহার" নামক এক লঘু পুস্তক লিখেছেন, যেখানে সে মাংসাহারের পক্ষে বৈজ্ঞানিক তর্ক দেওয়ার অসফল প্রয়াস করে। এসবের উত্তরে আচার্য জী "মাংসাহার - ধর্ম, অর্থ এবং বিজ্ঞানের আলোকে" পুস্তক লিখে তাকে তর্কপূর্বক উত্তর দিয়ে ছিলেন। সেখানে তিনি ফারুকের প্রত্যেক তর্কের কোমর ভেঙে দিয়ে ছিলেন। এখন সেই পুস্তকের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত করা হচ্ছে, যেখানে কিছু নতুন অধ্যায়, আচার্য জীর নিজের মন্ত্রের ভাষ্য জুড়ে এক নতুন রূপ দেওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে।

কিছু তথাকথিত ব্রাহ্মণ অথবা বেদ বিরোধীরা আমাদের কিছু আর্ষ গ্রন্থে মিশ্রণ করে দেয় তথা গ্রন্থকে না বুঝতে পেরে তার ভুল অর্থ করে দেয়, এই কারণে আর্ষ গ্রন্থে কোথাও কোথাও মাংসাহারের প্রকরণ দেখতে পাওয়া যায়। বেদ-বিরোধী লোক এরই লাভ নিয়ে এই মহান গ্রন্থের উপর আক্ষেপ লাগায়। আর্ষ গ্রন্থের উপর এইরকম দোষের খণ্ডনও এই পুস্তকে দেখতে পাওয়া যাবে।

আমার বিশ্বাস যে এই পুস্তককে পড়ে লোক ভ্রমিত হওয়ার থেকে বাঁচবে তথা সকল বুদ্ধিমান এবং সভ্য মহানুভব মাংস, মাছ, ডিম আদি অভক্ষ্য পদার্থের ত্যাগ করবেন, যারফলে মানব জাতি অনেক রোগ থেকে মুক্ত হবে, পরিবেশ শুদ্ধ হবে আর প্রাকৃতিক প্রকোপও কম হবে। আমরা মূক জীবদের বাঁচতে দি তথা বিশ্বে দয়া, করুণার মতো মানবীয় গুণগুলোকে বাড়াই, এরদ্বারাই বিশ্বে শান্তি এবং আনন্দের জলবায়ু হবে। আশা করি এই পুস্তককে পড়ে প্রবুদ্ধ পাঠক গম্ভীরতার সঙ্গে বিচার করবেন। এই আশার সঙ্গে

বিশাল আর্য (অগ্নিয়শ বেদার্থী), উপাচার্য
M.Sc. Theoretical Physics (University of Delhi)
বৈদিক এবং আধুনিক ভৌতিকী শোধ সংস্থান

• ভূমিকা •

পরোপকারিণী সভা, অজমের দ্বারা প্রেষিত ইসলামী সাহিত্য প্রকাশন, দোবত মঞ্জিল, কালুপুর টাওয়ার এর নিকট, আহমেদাবাদ - ১ দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত, শ্রী ইকবাল মীরঝা দ্বারা হিন্দিতে অনূদিত তথা শ্রীমান মুহাম্মদ ফারুক খান জী দ্বারা লিখিত **'দয়াভাব আর মাংসাহার'** নামক ১৪ পৃষ্ঠিয় নিবন্ধটি পড়লাম। লেখক বড় পরিশ্রম করে নিবন্ধটি তৈরি করেছে, কিছু ভালো যুক্তি তথা বৈজ্ঞানিকতারও প্রভাবি সমাবেশ রয়েছে। সম্ভবতঃ মাংসাহারের সমর্থনে এর থেকে ভালো নিবন্ধ পড়ার কমই পাওয়া যাবে কিন্তু বৈদিক বিচারের যথার্থতা এবং সত্য গ্রহণের ইচ্ছা তথা মিথ্যার পরিত্যাগের ভাবনা দেখা যায় না। এই কারণে নিবন্ধটি বিজ্ঞানকে ঘিরে তথা বৈদিক বাঙ্গময়ের স্বাধ্যায়ের প্রদর্শক হয়েও অজ্ঞানতা, অবৈদিকতা তথা অসফল তর্কের কেবল বাক্স হয়ে রয়ে গেছে। যদি শুধুমাত্র এমনটা না হয়ে নিবন্ধটি পূর্ণ যথার্থবাদী তথা দুরাগ্রহ - মুক্ত হত, তবে বড় আনন্দ লাগতো। লেখক মহোদয়ের নিকট আবেদন যে স্বয়ংকে ইসলামের কুয়ো থেকে বাইরে বেরিয়ে মানবতার খোলা পরিবেশে এসে নিষ্পক্ষ ও উদার হৃদয় এবং বৈজ্ঞানিক মস্তিকতে অসত্যের পরিত্যাগ তথা সত্যকে গ্রহণ করার জন্য উদ্যত হবেন, যাতে মজহবী মনভেদ এবং মতভেদ দূর হয়ে মানব একতার মার্গ প্রশস্ত হতে পারে। আমি এই পুনীত কার্যে আপনার সঙ্গে আছি।

আমি এই লঘু পুস্তিকা, যা বিশেষ করে শ্রী মুহম্মদ ফারুখ খান জীর নিবন্ধের উত্তরে লেখা হয়েছে, তার মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত মহানুভবগণ, যারা মাংসাহার বা ডিম্বাহারকে লাভদায়ক তথা বৈজ্ঞানিক ও আর্থিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা উচিত ও আবশ্যক মানে ও প্রচারিত করে, তথা বৈদিক কালে মাংসাহারের প্রচলন ও ঋষিদের এবং ক্ষত্রিয় রাজাদের মাংসাহারী হওয়ার প্রচার করে, তাদের বিনম্র নিবেদন করছি যে **তারা নিজের মন, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে দূষিত দুরাগ্রহগ্রস্ত বা বন্ধ কপাট খুলে সত্য, ন্যায়, যথার্থ বিজ্ঞান, মানবতা আদির প্রকাশেই ভাবার ও দেখার স্বভাব বানাক তথা সকল প্রাণীদের মধ্যে আমাদের মতোই আত্মা আছে, যা আমাদের মতোই সুখ বা দুঃখ অনুভব করে, এই সত্য কখনও যেন না ভুলে যায়।** সকলে নিষ্পক্ষতা দ্বারা এই পুস্তকের বিষয় বস্তুর উপর গম্ভীতার সঙ্গে মনন চিন্তন করে সত্য ও হিতকারী পক্ষেরই গ্রহণ করুক ও করাবে, যাতে তারা সঠিক অর্থে মানব বলার অধিকারী হতে পারে।

ভূমিকা বিস্তারকে বিরাম দিয়ে নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত সমীক্ষার উপর আসছি। ফারুক মহাশয়! আপনি নিজের নিবন্ধের প্রারম্ভে মাংসাহারকে অনুচিত যারা মনে করে তাদের তুচ্ছ ও চিন্তনহীন বলে লিখেছেন -
"এটা হল এক এমন দৃষ্টিকোণ যে যা কেবল সেই লোকদের বিচারকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে, যাদের বিচার করার যোগ্যতা, বোঝার যোগ্যতা আর চিন্তন করার স্বভাব নেই।"

সমীক্ষা - আপনার দৃষ্টিতে মাংসাহারের সমর্থকরাই বুদ্ধিমান, চিন্তক এবং বিচারক হতে পারে। এর পরীক্ষা এই নিবন্ধেই হয়ে যাবে। আজীবিকা আর আর্থিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা মাংসের স্থান শীর্ষকের অন্তর্গত **আপনি লিখেছেন -**

"যদি দয়া আর ন্যায়ের এই দৃষ্টিকোণকে মেনে নেওয়া যায়, তখন সংসারে মানুষের জীবিত থাকা মুশকিল হয়ে যাবে - সংসারে বেশিরভাগ মানুষের জীবনের আঁধার মাংসের উপর টিকে আছে।"
আপনি ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, চিন আদি দেশে ব্যাপক মাংস উৎপাদন তথা মৎস্য উদ্যোগের চর্চা করেছেন। গ্রীনল্যান্ড দেশ তথা এস্কিমো লোকেদের অনিবার্য মাংস ও মৎস্য আহারের চর্চা করেছেন। এছাড়া চর্বি, চামড়া দ্বারা অর্থ প্রাপ্তিরও চর্চা করেছেন।

সমীক্ষা - মহানুভব আপনার কথা হল যে, মাংসাহার ত্যাগ করলে মনুষ্য জাতির জীবিত থাকা কঠিন হয়ে যাবে কারণ খাদ্যান্ন সংকট বেড়ে যাবে, কিন্তু বাস্তবিকতা হল এটা যে, মাংসাহার ত্যাগ করলে খাদ্যান্ন এত বেড়ে যাবে যে মনুষ্য জাতি খেতেও পারবে না। যেই দেশের চর্চা করেছেন তারমধ্যে অধিকাংশ দেশ খাদ্যান্ন, ফল তথা দুধ উৎপাদনে অগ্রণী আছে তারপরও যদি মাংস মাছের মতো নোংরা অভক্ষ্যা পদার্থ খায়, তবে তার মতির ভ্রষ্টতাই বলা হবে। আমেরিকা স্বয়ং কম জনসংখ্যা কারী দেশ হয়েও গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নত দেশ, তাহলে মাংস মাছ খাওয়া কি খিদে মেটানোর জন্য করা হয়? কেন সেই অভাগা দেশ নিজের ৭০ শতাংশ অন্ন সেখানে পশুদের মাংস-উৎপাদন হেতু খাওয়ায়? যদি তারা মাংস-উৎপাদনকে বন্ধ করে দেয়, তবে বিশ্বের প্রোটিনের আবশ্যকতা পূর্ণ হতে পারে।

• মাংসাহার এবং অর্থশাস্ত্র •

ফ্রান্সিসী মহিলা বৈজ্ঞানিক "ডায়ট ফর স্মোল প্লেনেটস" লিখেছেন -
প্রোটিনের জন্য মাংসাহার হল বড় মূর্খতা। আমেরিকা যত পরিমাণ প্রোটিন মবেশিয়দের (গবাদি পশুদের) খাওয়ায়, অত প্রোটিনে তো গরীব দেশেগুলোর অভাবগ্রস্ত লোকদের সমস্যা সমাধান হয়ে যেতে পারে। এই বৈজ্ঞানিকের অনুসারে গড়ে এক গাভী ১৬ পাউন্ড অন্ন খেয়ে ১পাউন্ড মাংস দেয়। শেষ ১৫ পাউন্ড তার হাড্ডি, লোম আদির উপর খরচ হয়। মাংসাহার এই কারণে খাদ্যান্ন সংকটের সমাধানের কর্তা নয় বরং সমস্যা উৎপাদক। যদি সব দেশগুলো মাংসাহারকে পূর্ণবন্ধ করে দেয়, তবে বিশ্বে কেউ ক্ষুধার্ত থাকবেই না। না কাউকে নোংরা খাদ্য বাস্তবে অখাদ্য মাছ আদি খাওয়ার আবশ্যকতা পড়বে। এক অধ্যয়নের অনুসারে ২৪ লাখ টন মাংস প্রোটিন হেতু ২ কোটি টন বনস্পতিক প্রোটিন পশুদের খাওয়ানো হয়। বলুন মোহম্মদ জী!

কিরকম গণিত আপনি শিখেছেন? ১ টাকা পাওয়ার হেতু ১০ টাকা খরচা করার ওকালতি করছেন, আবার লাভেরও কথা বলছেন! পশুদের ১ কেজি মাংসের জন্য ৭ কেজি অন্ন খাওয়ানো হয়। সেখানে ৭০০০ লিটার জলও খরচা হয়। এরকম সময় বাড়তে থাকা জনসংখ্যা এবং ঘোর জল সংকটের মাঝে কোন ব্যাক্তি মাংসাহারের প্রোত্সাহনের মূর্খতা করে জল ও খাদ্য সংকটকে বাড়ানোর পাপ করবে। এক আমেরিকান অর্থশাস্ত্রীর অনুসারে ৪ ওন্স ওজনের হৈম্বর্গ ছোট মুরগীকে পালন করতে ৫৫ বর্গ ফিট বন নষ্ট হয়। কেলিফোর্নিয়াতে হওয়া এক অধ্যয়ন অনুসারে ১ পাউন্ড উৎপাদনে জলের খরচ নিম্নানুসার -

• শাকসবজি ২০ গেলন
• গম ২৫ গেলন
• আপেল ৪৯ গেলন
• দুধ ১৩০ গেলন
• ডিম ৫০০ গেলন
• শুয়োরের মাংস ১০৩০ গেলন
• গো মাংস ৫২১৯ গেলন আদি।

লন্ডনের কিংস কলেজের প্রফেসর জোন এন্থনী এলোনের অনুসারে ১ কেজি গম উৎপাদনে প্রায় ১ হাজার লিটার জল, অথচ ১ কেজি মাংসে ১৫ হাজার লিটার জল, আর ডিমে ৩৩০০ লিটার জলের আবশ্যকতা হয়। আবার মাংসাহারী রন্ধনেও শাকাহারী রন্ধনের তুলনায় অধিক জল ব্যয় হয়।

দেখুন অর্থশাস্ত্রিন্! আপনার প্রিয়তম খাদ্য গোমাংস দ্বারা সর্বাধিক হানি আর্থিক তথা পরিবেশের দৃষ্টিতে হয়। স্বাস্থ্য বিষয়ের চর্চা আমি পরে বলছি। যেখানে বিশ্বের পরিবেশবিদ্ পানীয় জলের ঘোর সংকটের সতর্ক করছে, জলের জন্য রাষ্ট্র ও রাজ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে, কোথাও কোথাও এক মোগ জলের জন্য পারা-প্রতিবেশী লড়ে মরছে। ভূজল স্তর নিরন্তর ঘাতক রূপে নিম্নে যাচ্ছে, সেখানে আপনি এমন মাংসাহারী বন্ধু জিহ্বার লোলুপতায় বশীভূত মাংসাহারের ওকালতি করে পানীয় জল ও বনের ঘোর সংকট উৎপন্ন করার দ্বিগুণ পাপ করছেন। আপনি শুধু নিজের এই ভারত দেশের লোকের মূর্খতার উপরেই দৃষ্টি দিন, নিজের ভারতে ক্ষুধায় পীড়িত ব্যাক্তি মাংস খায় কি, নাকি জিহ্বালোলুপ ও ক্রুরতায় আনন্দকারী লোকেরা খায়? আমাদের দেশ প্রতিবর্ষে ২১ কোটি টন খাদ্যান্ন উৎপন্ন করে। প্রত্যেক ব্যাক্তি ৫০০ গ্রামের অধিক অন্ন প্রাপ্ত করতে পারে। সরকারি গুড়ামগুলোতে অন্ন পচে যাচ্ছে। কতই না অন্ন মাংস-উৎপাদক পশু পাখি খেয়ে ফেলে আর লক্ষ লক্ষ একর ভূমিতে চা, কফি, তাম্বাকু, ভাঙ্গ, গাঁজা, আফিমের মতো বিষের কৃষি এখানের মূর্খ কৃষক করছে তথা ধূর্ত পাপী প্রশাসন এদের সহায়তা করছে, প্রোত্সাহন দিচ্ছে। লাখ টন আঙ্গুর তথা গুড় পচিয়ে মদের উৎপাদন করা হচ্ছে। বার্লি আদি অন্নকে পচিয়ে বীয়ার আদি বানিয়ে জনগনকে পাপের ফাঁদে ধাক্কানো হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ ভূমি অনুর্বর জমি হয়ে পড়ে আছে, এরপর কোন বুদ্ধিমান বলতে পারে যে - পরমাত্মা অন্ন, ফল ও দুধের কমতি রেখেছে, যার জন্য বাধ্য হয়ে মাছ মাংস খেতে হচ্ছে? আমার স্পষ্ট মত হল যেখানেই

মাংসের স্রোত পশু, পাখি, মাছ আদি আছে, সেখানে উদ্ভিদও অবশ্যই উৎপন্ন হয়, যেখানে অন্ন, শাক নেই, সেখানে পুরুষার্থ দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করা যেতে পারে। যখন চাঁদে কৃষি করার কল্পনা মানব করতে পারে তখন এই ভূমন্ডলে কেন তা সম্ভব হবে না? আবশ্যকতা হল প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং কঠিন পুরুষার্থের, তবুও যেখানে কৃষি হয় না, সেখানে বাস করবেই বা কেন? কেউ আকাশে উঠে বলে যে এখানে দুধ, অন্ন, ফল তো হয় না, তাই আমি কাক, চামচিকে, চিল ও শকুন খাবো, তো খাক না, তার যখন ইচ্ছে। কর্মহীনকে কে বোঝাবে যে নিচে নেমে ভূমির অমৃত গোদুগ্ধ, ফল, অন্ন, বাদাম খেয়ে নাও। কেউ যদি এভারেস্টের চূড়ায় বসে পেট ভোরার উপায় জানতে চায়, তাহলে পাথরের দুই টুকরো খাক অথবা বরফ খেয়েনিক। যেই এস্কিমোর কথা বলছেন, সেখানকার মাংসাহারীরা রেন্ডিয়ার পশুর দুধও পান করে। সেই রেন্ডিয়ার তো মাছ খায় না, তবে সে যে গাছপালা খায়, তার বীজও নিশ্চয় জন্মায়, তাহলে মনুষ্য তার থেকে কেন কাজ চালাতে পারে না? যখন দুধ আছে, গাছপালার বীজ আর গাছগাছালিও রয়েছে, তা সত্ত্বেও যদি সে মাছ খায় তো তার মতিভ্রষ্টতা নয় তো কি হবে? যদি এতে তৃপ্তি পূর্ণ উপলব্ধতা না হয়, তবে বৈজ্ঞানিক প্রয়োত্ন হোক, তবুও অসফলতা হলে, তখন সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়া উচিত। এটা তো আপনার মাংস আধারিত অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষা হল। এখন **আপনি লিখেছেন -**

"পশুদের কাটতে অথবা শিকার করতে যে নিষেধ তা যদি মানা হয় তবে বেকার আর ফালতু পশু সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।"

সমীক্ষা - সর্বপ্রথম আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে - আপনি এটা কেন চান যে ভূমিতে কেবল মনুষ্যই থাকুক আর কোনো প্রাণীর বাঁচার অধিকারই নেই, তারা কি ঈশ্বরের সন্তান নয়? আপনার খুদা কি তাদের জন্য রহীম নয়? দ্বিতীয় কথা আমি এটা জিজ্ঞেস করতে চাই যে - কুকুর, কাক, সাপ, বাঘ, চিতা, শেয়ালদের বেশিরভাগ লোকে খায় না, অনেক কীট-পতঙ্গকেও মনুষ্য খায় না। বিচ্ছু, টিকটিকি, মৌমাছি, মাছিকেও খায় না, তাহলে এদের সংখ্যা কেন বাড়ছে না? তবে হ্যাঁ, কোথাও কিছু মাংসাহারী এমনও আছে যারা এই কুকুর, বিড়াল, কাক, ইদুর আদি সবকে চেটে ফেলে। তারপর শুয়োরকে হারাম বলে দিলেন, তাহলে এদের কোথায় রাখা যায় বলুন তো, তারও পরামর্শ দিবেন। স্মরণে রাখবেন যে, মনুষ্য এসবের ঠিকাদার নয়, পরমাত্মা স্বয়ং সম্পূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখে।

তৃতীয় কথা আমি এটা জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আজ সর্বাধিক সংখ্যা তো মানুষের বাড়ছে, সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবিরা এর প্রতি বিশেষ সচেতন দেখা যায়। বিশ্বে কৃত্রিম পরিবার বিয়োজন বা ভ্রূণহত্যার মতো কুকর্ম করা হচ্ছে। চার-চার বিবাহকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির তো কি বলবো! তাহলে কি এদেরকে খাওয়াও শুরু করবেন? বলুন মহাশয় কিরকম হবে? সকলের চিন্তা মিটে যাক আর এই মাংস অন্য মাংসের থেকে শ্রেষ্ঠও হবে। নোংরা ভক্ষণকারী মুরগা-মুরগী বা ঘাস-পাতা ভক্ষণকারী গাভী-মোষ, ছাগল-ভেড়া, উট আদির

তুলনায় দুধ, অন্ন, বাদাম, ফল আদি ভক্ষণকারী মানুষেরই মাংস খেলে কেমন হয়? মহাশয়! একটু ভাবুন খুদা এইরকম নির্দেশ কেন দেয় নি? তবে কি সবার অধিক রহমতের পাত্র কেবল মনুষ্য, শুয়োর আর মাংসাহারী প্রাণীরাই থাকবে? তাহলে তো শুয়োর, মনুষ্য, কুকুর ও বিড়ালই খুদার সম্বন্ধী হওয়ায় ভাই-ভাই হয়ে গেল। আপনি কি এটা স্বীকার করেন? যদি হ্যাঁ, তবে আপনার তো উচিত গাভী, মোহিষী, ভেড়ী, ছাগী আদির দুধ পান করা বাদ দিয়ে নিজের ভাই সম্বন্ধী শুয়োরনী, কুত্তী, শেয়ালনীর দুধ, দই, ঘী পান করে আনন্দ করবেন। কারণ আপনার খুদা এই পশুগুলোর উপরই বিশেষ মেহরবান রাখে। আপনি ভূড়ের মাংসকে হারাম বলেছেন! আমি জানি না ভূড় কিসের নাম? কুরআনের অধ্যয়নের আধারে আর আপনার বিবরণের আধারে ভূড়ের অর্থ শুয়োর প্রতীত হচ্ছে। যদি অন্য কোনো অর্থ হয় তবে কৃপা করে অবগত করাবেন। **আপনি বলেছেন -**

"বাস্তবে ভূড় ইসলামে নৈতিক দৃষ্টি থেকে হারাম মানা হয়। অন্নেরও মানুষের স্বভাবের উপর প্রভাব পরে। ভূড়ের মাংস নিজের ভিতর নির্লজ্জতা উৎপন্ন করে, সেটা খেলে মানুষের স্বভাব অত্যন্ত নিকৃষ্ট হয়ে যায়! ভূড় হল এক নির্লজ্জ পশু। মাদা ভূড়ের চতুর্দিকে অন্য নর ভূড় একত্রিত হয়ে একের পর এক তার সঙ্গে সম্ভোগ করে। এটা নির্লজ্জের পরাকাষ্ঠা, যা কিঞ্চিৎই অন্য পশুতে দেখতে পাওয়া যায়।"

সমীক্ষা - আশ্চর্য বিষয় যে ক্রূর্তাপূর্বক পশু হত্যাকারীরাও নৈতিকতার কথা বলে। শুয়োরকে নির্লজ্জ পশু বললেন। আমি জিজ্ঞেস করছি যে মুরগী, গৌ, ছাগী, মোহিষী, ভেড়ী কি বুর্কা অথবা শাড়ী পরে, যার জন্য তাদের লজ্জাবতী বলা যায় এবং ছাগল, ভেড়া, ষাঁড়, মোষ, মোরগ কি পায়জামা, টুপি, শেরওয়ানি, ধুতি বা প্যান্ট পরে নম্রতা দেখায়? যারা এক সাথে এক মাদার সঙ্গে অনেক নরের সহবাসের কথা বলে, তারা তো সেই পশুদের মধ্যে দেখা যেতে পারে, যারা দলে স্বতন্ত্র বিচরণ করে তথা যাদের ঋতুকাল লম্বা হয়। তারপর কিছু মানুষের মধ্যেই দেখে নিন, যেখানে কিছু লোকে এক সঙ্গে অনেক স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক করে। যখন এক মাদার সঙ্গে অনেক নরের সম্পর্ক নির্লজ্জ হয়, তখন এক নরের সঙ্গে অনেক মাদাদের সঙ্গে সম্পর্ক কিভাবে সজ্জনতা আর শালীনতা (নম্রতা) হয়ে গেল? তারপর মজহবী দাঙ্গা অথবা অনেকবার সামান্য পরিস্থিতিতেও এই কামীর ইন্সান মহিলাদের সঙ্গে সমষ্টিগত ভাবে ধর্ষণ করে আর এরকম করে মেরেও ফেলে, তখন এই ইন্সানের তুলনা কার সঙ্গে করা যায়, একটু ভাবুন। আমি আপনার এই তর্কের উত্তরে এটাও বলতে চাইবো যে, যখন অন্নের (ভোজনের) প্রভাব স্বীকার করছেন, **তাহলে আপনাকে নোংরা ভক্ষণকারী মুরগা-মুরগী তথা তৃণাদি ভক্ষণকারী তথা নগ্ন নির্লজ্জ পশুদের ছেড়ে দিয়ে লজ্জাবান্ বুদ্ধিজীবিদের মাংস খাওয়া উচিত।** তাহলে বোঝা যাবে যে আপনার তর্ক কত ফালতু ও অনাবশ্যক। পশু পাখি তো খোলা সহবাস করে তাহলে তাদের মাংস খেলে লজ্জবান কি করে থাকা যাবে? তারপর কাকের মাংস কেন খান না, যাকে সহবাস করতে হয়তো কেউ দেখে থাকবে। মহাশয়! অনুচিত তর্ক দ্বারা স্বপক্ষপোষণ করা অসফলই থেকে যায়। যদি পুষ্টিকতার লোভে মাংস খান তবে শুয়োরের মাংসই হল সর্বাধিক পুষ্টিকর, যেখানে ৪৯ শতাংশ ফ্যাট (FAT)এর মাত্রা আছে, যা অন্য কোনো মাংসে নেই। আপনি

যে গাভী, মোষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগার মাংস খান, সেগুলো শুয়োরের মাংসের তুলনায় পুষ্টিকতার দৃষ্টিতে নিম্ন হয়ে থাকে, আবার এগুলোতে হানিকারক পদার্থ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাও শুয়োরের মাংসের তুলনায় অধিক থাকে। এই মাত্রা গোমাংসে যেখানে ১৪.৪৫ শতাংশ আছে, সেখানে শুয়োরের মাংসে কেবল ৮.৪৮ শতাংশ মাত্র, শুয়োরের মাংস যেখানে ৫.২৫ ঘন্টায় পচে, সেখানে গোমাংস ৫.৫০ ঘন্টায় পচে। তাহলে গোমাংসের থেকে শুয়োরের মাংস প্রত্যেক দিক দিয়ে হল শ্রেষ্ঠ। তাহলে পরে মাংসাহারের বিজ্ঞানী আপনি কেন শুয়োরের মাংসকে হারাম মানছেন? এরজন্যই কি যে এটা কুরআনে লেখা আছে? তবে কেন সকলে তা মানবে? কথা তো এমন বলা উচিত যা সকলের হিতে হবে, না কি কোনো মজহব বিশেষের পূর্বাগ্রহোতে গ্রস্ত হবে? তাহলে আমি এটাও বলবো যে, কুরআনের আদেশকে কেই বা মেনে চলে! দেখুন হজরত মুহম্মদ সাহেব কি বলে -

"সে তোমার উপর মরে যাওয়া পশু লহূ (রক্ত) আর শুয়োরের গোস্ত হারাম করে দিয়েছে।" সূর - বকর, পার, স য়কূল, আয়ত ১৭৩ দেখুন।

মহাশয়! আছে কেউ খুদার বন্দা বা রসূলের ভক্ত? যে জীবিত পশুকে কুকুর বিড়ালের মতো খেয়ে যায় অথবা সাপ, কুমির অথবা টিকটিকির মতো জীবিতই গিলে নেয়? কেউ এটা বলুক যে স্বয়ং নিজে হত্যা করে খাওয়া উচিত, মরে যাওয়া নয়, তাহলে তো আমি প্রথমে বলবো যে, কুরআনে এরকম কোথায় লেখা আছে? কেবল এটাই লেখা আছে যে - মরা পশু হল হারাম। তাহলে স্বয়ং হত্যা করার কথা কিভাবে সিদ্ধ হল? যদি এটাকেও মানা হয়, তবে ভারত আর বিশ্বের সমস্ত কসাইখানা ততকাল বন্ধ করে দেওয়া উচিত কারণ এদের মাংস ভক্ষণকারী কুরআনের আজ্ঞা ভঙ্গ করায় কাফির সিদ্ধ হল আর কাফিরের দণ্ড হল মৃত্যু। তারপর কিনে খাওয়া মাংস ভক্ষণকারীদের সর্বপ্রথম মৃত্যু দন্ড দেওয়া উচিত, তারপর কসাইকে, যারা হল লোকেদের কাফির বানানোর সহায়ক। যে মাংস খেতে চায় আর নিজেকে ইসলামী বলে, তবে মুরগা, মুরগীকে ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক, যদি এমনটা না করে, তাহলে নিজেই হত্যা করুক। এই বিধান আমার অথবা বৈদিক ধর্মের কখনই নয়, বরং আপনার বিধানকেই আপনাকে বোঝাতে হচ্ছে।

আপনি নিজের নিবন্ধে লহূকে (রক্তকে) মানুষের প্রথম ভোজন বলেছেন, যেখানে আপনার রসূল বা খুদা লহূকে হারাম বলেছে। এখন আপনি স্বয়ং, আপনার খুদা বা রসূল মিলে নির্ণয় করুন যে, লহূ (রক্ত) কি মানুষের ভোজন?

• মাংস মনুষ্যের ভোজন নয় •

আপনি লিখেছেন -

"ডিম আর মাংস এই দুটোই এক সজ্জন মানুষের ভোজন হতে পারে। তারা জানে না যে মানুষের সবার প্রারম্ভে ভোজন মাংস আর লহূই (রক্তই) ছিল। মায়ের গর্ভে মাংস আর রক্ত দ্বারাই তার পালন হয়।"

সমীক্ষা - এখানে আপনি বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়েও অজ্ঞানে ভেসে গেলেন, তারপরও প্রবুদ্ধগণদের মতো ছলের অসফল প্রয়াস করেছেন। মায়ের গর্ভে মায়ের রক্ত দ্বারা বাচ্চার সকল আবশ্যক তত্ব পাওয়াটা তো ঠিক কিন্তু মাংসের উপযোগ হওয়া এটা নিতান্ত অসত্য ও বিভ্রান্তিকর। মা যেটা ভোজন করে, সেটা রস রূপে তার রক্ত দ্বারা ভ্রূণের পালনে সহযোগী হয়। আমি জিজ্ঞেস করছি, তাহলে তো নিজের মায়ের রক্ত পান করা তার মাংসও খাওয়া সবথেকে প্রাকৃতিক, আপনি মানবেন? বিশ্বে আছে কোনো মাংসাহারের সমর্থক বিশেষ করে আপনার মতো, বিভ্রান্তিকর কুতর্ক প্রস্তুতকারী, যে নিজের মাকে মেরে খেতে পারে? এরপর আমি জিজ্ঞেস করছি যে, সেসময় তো মায়ের রক্ত বাচ্চার নল দ্বারা বাচ্চা প্রাপ্ত করে না কি মুখ দ্বারা? সেই সময় বাচ্চা মায়ের অঙ্গের মতোই কাজ করে। যেমন আমাদের শরীরের ভোজন, যকৃৎ, আমাশয়, গৃহণী ও অন্ত্র দ্বারা তৈরী রস রক্তে মিলে আমাদের সকল শরীরাঙ্গের পোষণ করে, ঠিক সেইপ্রকারে মায়ের শরীরাঙ্গের সমান ভ্রূণের পোষণও সেই প্রকারে ঘটে। এই প্রক্রিয়া না কেবল মানুষের বরং সকল প্রাণীদের মধ্যে ঘটে। তাহলে কি হাতি, গাভী, ঘোড়া, ছাগল, ভেরা খরগোশ সকলকে মাংস খাওয়ানো উচিত? তাদেরও প্রাকৃতিক ভোজন আপনার দৃষ্টিতে মায়ের রক্ত আর মাংস ছিল। মনে হচ্ছে এমনটা যে, আপনি শরীর ক্রিয়াবিজ্ঞান দ্বারা অনভিজ্ঞ লোকেদের বিভ্রান্ত করতে চান। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে, যদি আপনি এখনও এইরকম কুতর্কের জিদ করেন তবে কি আপনি এইরকম করবেন -

১. নাভি দ্বারা নিজের মায়ের রক্ত আর অন্য প্রাণীদের রক্ত পান করবেন?
২. এছাড়া আপনার এই তর্ক দ্বারা ডিম, মাংস তো অপ্রাকৃতিক সিদ্ধ হবে, তবে কি এগুলো খাওয়া ছেড়ে দিবেন?
৩. গর্ভের মধ্যে তো মল-মূত্রাদি ত্যাগও মায়ের অঙ্গ দ্বারাই ভ্রূণ করে থাকে, নিজের অঙ্গ দ্বারা করে না, তবে কি আপনিও এরকমটা করবেন? যদি আপনি এরকম না করতে পারেন তাহলে আপনার তর্ক বালুর প্রাচীর দিয়ে তৈরি মহল সিদ্ধ হল কি না?

আপনার এই কথন সত্য যে ভারতে দুধের অভাবের কারণ খারাপ বংশ হওয়া, যার উপর ধ্যান দেওয়া উচিত। কিন্তু যে পশু দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাকে হত্যা করে খাওয়া নিতান্ত অনৈক্তা, অপ্রাকৃতিক খারাপ কর্ম। কখনও অসুস্থ তথা বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে মেরে খেয়ে ফেলার অনুমতি কোনো অর্থশাস্ত্রী দিতে

পারবে? যদি এরকম কেউ বলেও দেয়, তো সে অনেক ধূর্ত আর পাপীই হতে পারে, আর তাকেও তার সন্তান দ্বারা হত্যা করে খাওয়ার কুফল ভুগতে হবে। আপনি বলুন যে আপনার ধর্মগ্রন্থ বা কারও ধর্মগ্রন্থ এইরকম আজ্ঞা দেয়? আর যারা ধর্মকে মানে না, তারাও কি স্বয়ং এইরকম হত্যা চাইবে?

যে গাভী, ছাগী, মহিষীর মিষ্টি পৌষ্টিক দুধ পান করলেন, তাকে তার দুধ বন্ধ হতেই হত্যা করে খেয়ে ফেললেন। যে ছাগলটিকে খুব খাওয়ালেন, যত্ন করলেন, বড় আর মোটা করলেন, নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসা দিয়ে রেখেছেন, তাকে ঈদের দিন মালা পড়িয়ে হত্যা করে তাকে খেয়ে ফেললেন, আহা! কতই না কৃতঘ্নতা হল?

• মাংসাহারের অবৈজ্ঞানিকতা •

আপনি মাংসাহারের বৈজ্ঞানিকতার উপর লিখেছেন -

"মনুষ্য আর পশুদের মধ্যে এমন ক্ষমতা নেই যে তারা উদ্ভিদের মতো একদম পূর্ণ সরলতা তত্ব দ্বারা নিজেদের মিশ্রিত পদার্থ বানাতে পারে। ভোজনে প্রোটিন, বসা (FAT), কার্বোহাইড্রেট, খনিজ, ভিটামিন আদি লাগে কিন্তু তবুও মানুষের মধ্যে যে প্রাণী প্রোটিনের আবশ্যকতা রয়েছে, তার পূর্তি উদ্ভিজ(ফল, শাক-সবজি) প্রোটিন দ্বারা হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে উপযুক্ত জলবায়ুতে মানুষের ভোজনে মাংসের উচিত মাত্রায় থাকাটা আবশ্যক।"

দয়ার প্রশ্নের উপর আপনি লিখেছেন -

"পশুদের তুলনায় উদ্ভিদ হল বেশি দয়ার পাত্র, যেরকম উদ্ভিদরা চলা-ফেরা করতে অক্ষম, তাদেরও তো সুখ দুঃখের অনুভব হয়। তাহলে দয়া ন্যায়ের এই দৃষ্টিকোণকে মেনে নিলে, মানুষের অধিকার বিশ্বের কোনো কিছুরই উপর থাকবে না। মাংসাহারের বিরোধ করলে পরে উদ্ভিদের উপরও আমাদের কোনো অধিকার থাকবে না।"

সমীক্ষা - আপনার কথন হল এই যে, মনুষ্য এবং পশু আদি উদ্ভিদের মতো ভূমি থেকে সরাসরি তত্ব গ্রহণ করতে পারে না, এটা কেবল নিবন্ধের চতুরতা বাড়ানো হয়েছে। কারণ এমন কোন শাকাহারী বলে যে, আমাদের মাটি, জল, হওয়া থেকে উদ্ভিদের মতো সরাসরি আহার গ্রহণ করতে হবে। তাই আপনি কেবল পাঠকদের নিজের বৈজ্ঞানিকতার প্রদর্শন করার হেতুই লিখেছেন, যাতে অল্পমতির লোকে আপনার উপর আকর্ষিত হতে পারে, যেটা হল অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক। আরও অন্য অনেক কথা যেমন চামড়ার

উপযোগিতা, রেশম উদ্যোগ, মাংসাহারী গাছের চারা আদির ব্যর্থ লেখা হয়েছে। যতদূর প্রোটিন প্রাপ্তির কথা রয়েছে, তা আমি পূর্বেই এই কথায় স্পষ্ট করেছি যে, মাংস-প্রোটিন প্রাপ্তি হেতু তার থেকে কয়েক গুন অধিক উদ্ভিজ-প্রোটিন হারাতে হয়। তাহলে এরকম মূর্খতা কেন করবে? আপনি এটা লিখেছেন যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে মনুষ্যের ভোজনে মাংস-প্রোটিন আবশ্যক, তাহলে আমি জিজ্ঞেস করতে চাইবো যে, বিশ্বে কখন আর কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে এই নিষ্কর্ষ বের করেছে যে, উদ্ভিদের স্থানে মাংস-প্রোটিন বেশি উত্তম হয়। যদি জৈব-প্রোটিনের কথা বলেন, তবে কি দুধ, দই, ঘৃতকে জৈব-প্রোটিনের রূপে নেওয়া যেতে পারে না? দুধ হল প্রাকৃতিক এবং প্রথম আহার হওয়ার কারণে মানব হেতু সর্বোত্তম খাদ্য। অঙ্কুরিত ডাল, অন্ন আদির প্রোটিন কি মাংস প্রোটিনের থেকেও কম গুণকারী? সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বৈজ্ঞানিক সৈমসন রাইট লিখেছেন যে, প্রোটিনের উক্ত বিভাজন অর্থাৎ মাংস-প্রোটিনের শ্রেষ্ঠতা আর উদ্ভিজ-প্রোটিনের নিম্নতা হল অবৈজ্ঞানিক আর অব্যবহারিক। তিনি তর্ক দিয়েছেন যে, পশুদের মাংসপেশীগুলো মূলত ঘাস খাওয়ার দ্বারাই তৈরি হয় অর্থাৎ উচ্চ স্তরের প্রোটিন ঘাস খাওয়ার ফলেই তৈরি হয়। তাহলে মানুষের জন্য উদ্ভিজ প্রোটিন নিকৃষ্ট কিভাবে হয়ে গেল? প্রোটিনের গুণবত্তা সেখানে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড, তার শোষণ এবং আত্তীকরণের উপর নির্ভর করে। যত শীঘ্র যে প্রোটিন পচে আর শরীরে কাজে লাগে, সেটা ততই উচ্চ গুণবত্তার প্রোটিন হয়। দুধ, দই, সয়াবিনের দুধ, দই, চিনেবাদামের প্রোটিন মাংস প্রোটিনের থেকেও অধিক শীঘ্র পচে এবং অবশোষিত হয়ে থাকে। রান্না করা মাংসে ভিটামিন বি-১ ও বি-২ হয়ই না, অথচ অঙ্কুরিতান্নে বি-১২, বি-১, বি-২, বি-৩, এবং অনেক প্রকারের এনজাইম্স পর্যাপ্ত মাত্রায় থাকে। কিন্তু যদি কারও জিহ্বা কেবল মাংসেরই স্বাদ চায় অথবা সাম্প্রদায়িক মিথ্যা ধারণা মাংসাহারের ক্রূর্তাপূর্ণ ভাবনা তৈরি করে, তাহলে কি আর করা যাবে? মহাশয়! যদি স্বাদই নিতে হয় তো একবার কাঁচা মাংস বা জীবিত পশুদের কুকুর, শিয়ালের মতো চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে দেখুন। আমার মান্যতা হল যে, প্রত্যেক মানব মাংসাহারের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা করে, এই কারণে তাকে ধুয়ে, ভেজে মসলা তেল দ্বারা সুস্বাদু বানিয়ে তারপর খায়, আর মাংস বিক্রেতা তাকে ঢেকে রাখে, অন্যদিকে ফল, দুধ, বাদাম, সালাদ, ফুল, অন্নের প্রতি কেউ ঘৃণা করে না। এদের কাঁচাও খাওয়া যায়। ফসলের অঙ্কুরণ হল শ্রেষ্ঠ পূর্ণ ভোজন। অন্য শাক আদিকে ধুয়ে, রন্ধন করে খাওয়া হয় অবশ্য কিন্তু তাদের কাঁচাও খাওয়া যেতে পারে আর প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এরথেকে অনেক অসাধ্য রোগও ঠিক করে থাকে। বিশ্বের মধ্যে আছে এমন কোনো ডাক্তার, যে মাংসকে কাঁচা খাওয়ানোর মাধ্যমে কোনো রোগকে ঠিক করতে পারে? আপনি ভোজনে পৌষ্টিকতার কথা বলেন, তবে সস্তায় মুগ ডাল, চিনেবাদাম, ছোলা, মাষকলাই আদিতে এত পরিমাণ প্রোটিন আছে যা কোনো মূল্যবান মাংসে হবেই না। মাংস প্রোটিনের সঙ্গে আপনাকে ইউরিক অম্ল আদি হানিকারক পদার্থও খেতে হয়, যা অনেক রোগ উৎপন্ন করে। অন্যদিকে অন্ন, ফল, দুধ, মাখন আদিতে এই বিষগুলোই নেই। মাংসাহার দ্বারা প্রাপ্ত এই বিষগুলোকে মূত্র সংস্থানও বাইরে বের করতে পারে না, যার ফলে চর্মরোগ, পচন শক্তির দুর্বলতা, কব্জ আদি রোগ জন্ম নেয়। এখন স্বাস্থ্য এবং মাংসাহার সম্বন্ধীয় আপনার তর্কের পরীক্ষার্থ কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রস্তুত করছি -

১. হার্বর্ড মেডিক্যাল কলেজের ডা০ এ. বাচমৈন, ডা০ ডি. এস. বর্ন্সটিনের কয়েক বছরের গবেষণার পরিণাম - মাংসাহারীদের মূত্র প্রায়ঃ অম্লীয় হয়ে থাকে, কারণ মাংস হতে অম্লতা উৎপন্ন হয়, ফলতঃ শরীরের পি. এচ. কে নিস্তেজ রাখার জন্য হাড়ের ক্ষারীয় লবণ মিশ্রিত হতে থাকে আর হাড় (Bones) দুর্বল হয়ে যায়।
২. মাংসাহার হতে হৃদয়রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, থ্রোম্বোসিস, প্যারালাইসিস, কিডনি ও কোলেসিস্টাইটিসের পাথর, যকৃত রোগ আদি হয়ে থাকে।
৩. জর্জিয়া স্কুল অফ মেডিসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. পি. সিডেন স্ট্রিকর, এ. পি. ব্রিগ্স তথা এন. এম. ড. বাউগ্রের অনুসারে ডিম হতে বিষণ্ণতা, হৃদয়ের উপর চাপ, চেতনশূন্যতা, কম্পন, বমি ভাব, ভারীপন, ক্লান্তি, কষ্ট, হিমোগ্লোবিনের অভাব আদি রোগ হয়ে থাকে। বিসকাঁন্সিনের তিন গবেষক কর্তাদের অনুসারে ডিম হতে যকৃত ক্যান্সারের সম্ভাবনা অধিক থাকে, কৃষি বিভাগ ফ্লোরিডা দ্বারা ১৮ মাসের গবেষণার অনুসারে ডিমের মধ্যে ৩০ শতাংশ ডি. ডি. টি. বিষ হয়ে থাকে।
৪. ডিমে কার্বোহাইড্রেট ও ক্যালসিয়াম অনেক কম থাকার দরুন পেটে পচন উৎপন্ন হয়ে থাকে।
৫. জার্মান ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার হিডলবর্গের ডা০ রৈনর ফ্রেইন্টজেল বেডম এবং তাদের সঙ্গীদের অনুসারে মাংসাহারীদের মধ্যে আমাশয় যকৃতের ক্যান্সার, মোটাপা, কোলেস্ট্রোল বৃদ্ধির আশঙ্কা অধিক হয়ে থাকে।
৬. মাংসাহারে রফেজ না থাকায় ডাইরিয়া, হেমোরয়েডস (Hemorrhoids), হর্নিয়া (Hernia), অ্যাপেন্ডিসাইটিস্, গর্ভাশয় ডিম্বগ্রন্থি, আমাশয়, অন্ত্রে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা অধিক হয়ে থাকে।
৭. জাপানের রাষ্ট্রীয় সংস্থানের নির্দেশক তাকেশী হীরায়ামার অনুসারে - ক্যান্সারের আশঙ্কা মাংসাহারের দ্বারা অনেক বেড়ে যায়।
৮. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের অনুসারে মাংসাহার হতে ১৬০ প্রকারের রোগ ছড়ায়। নোবেল পুরষ্কার বিজেতা আমেরিকান আয়ুর্বিজ্ঞানী ডা০ ব্রউন তথা গোল্ডস্টিনের অনুসারে মাংসাহারে হৃৎপিণ্ডাঘাত (Heart Attack) এর আশঙ্কা বেড়ে যায়।
৯. বিশ্ব প্রসিদ্ধ জার্মান প্রাকৃতিক চিকিৎসক লুই কূনের অনুসারে মানবদেহের জন্য মাংস হল অপ্রাকৃতিক ও রোগকারক আহার।
১০. মাংসাহারের বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে canker-এ ব্যথায় অসাধারণ বৃদ্ধি পায় - ডা০ উইলিয়াম রবর্ট, ডা০ সর্জেম্সসীয়র।
১১. মাংসাহার হতে দন্তরোগ পায়রিয়া রোগীর বৃদ্ধি হয় - মি০ আর্থর অন্ডারবুড, ডা০ মি. থোমাস জে. রোগন।
১২. মাংস থেকে ক্যানসার রোগ বাড়ে - ডা০ রসেল।
১৩. এটা সম্ভব যে কিছু ব্যাক্তি বিনা কোনো ক্ষতিতে মাংস সেবন করছে, কিন্তু এটা নিশ্চিত রয়েছে যে এই প্রকারের অমানুষিক ভোজনের পরিণাম শীঘ্র বা পরে অবশ্যই প্রকট হবে। লিভার আর কিডনি দূষিত হয়ে

নিজের কাজ ছেড়ে দেবে আর তার ফল স্বরূপ ক্ষয়, ক্যান্সার আর গঠিয়া (gout) আদি রোগ হয়ে যাবে। মেরী এস. ব্রাউন (রিজন ফর এবং ভেজিটেরিয়ান ডাইট)।
১৪. আমি মাংস সেবন ছেড়ে দেই, যার পরিণাম এটা হয় যে মাথাব্যথা, মানসিক ক্লান্ত তথা গঠিয়া রোগ, যারজন্য আমি বহুবর্ষ পীড়িত ছিলাম, তা দূর হয়ে যায় - ডা০ পার্কস।
১৫. আমেরিকার জনরল একাউন্টিং এর রিপোর্টার অনুসারে মাংসে ১৪৩ রসায়ন পাওয়া গেছে, যেখানে ৪৭ ক্যান্সার কারক ছিল।
১৬. আমেরিকার এক প্রতিষ্ঠিত রিসার্চ সংস্থা ওয়ার্ল্ড বাচের অনুসারে মাংসাহারীদের হার্ড অ্যাটাক, মধুমেহ, অন্ত্র ক্যান্সার আর অন্য ঘাতক রোগ অধিক হয়ে থাকে।

• মাংসাহার এবং পরিবেশ তন্ত্র •

শাকাহারের ক্ষেত্রে সারাবিশ্বে অগ্রণী ভূমিকা পালনকর্তা বিখ্যাত ভারতীয় ভৌতিক বৈজ্ঞানিক প্রফেসর মদনমোহন বাজাজ এবং ওনার সঙ্গী বৈজ্ঞানিকগণেরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন। উনি নিজের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় এটা সিদ্ধ করেছেন যে, মাংস আর মাছ খেলে না কেবল অনেক প্রকারের রোগ ছড়ায় বরং তারসঙ্গে এই পৃথিবীতে ভয়ংকর তুফান, ঘূর্ণি ঝর, ভূকম্প আদির তাণ্ডবও বৃদ্ধি পায়। তিনি আইনস্টাইন পেইন ওয়েভ-এর চর্চা করেছেন তথা হিংসা হতে উৎপন্ন তরঙ্গ দ্বারা না কেবল এই তাণ্ডব আর রোগের বরং এরফলে হিংসক মনুষ্যের জিন্স হতে সম্পূর্ণ গ্রহ, সৌরমণ্ডল ও গ্যালাক্সি এবং সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভাবিত হওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এটাকে Biso Cosmology বলেছেন। তিনি এই তরঙ্গের উপর ভিত্তি করে BIS Energy, BIS Field, Bisobiochemistry, Bisochemistry, Bisodynamics, Bisogenetics, Bisogeometry, Bisogynacology, Bisohematology, Bisomathematics, Bisoneurology, Bisophysics, Bisorheology, Bisostarics, BIS String Theory, Bisotopology আদি অনেক বিজ্ঞানের বিকাশ করেছেন। তথা মাংসাহার, মাছ, মদ্য, ডিম আদির ভক্ষণকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের জন্য হানিকারক সিদ্ধ করেছেন। ফারুক জী! কোথায় ঘুমাচ্ছেন আপনি? বলুন ফারুক খান জী! আরও বৈজ্ঞানিকের প্রমাণ লাগবে কি? আপনার স্মরণে থাকবে কিছু দিন পূর্বে "মৈক কাউ" নামক রোগ ইউরোপে ছড়ায়, যার ফলে গোভক্ষক পাপীগুলো মরে। এই রোগ সেই গাভীগুলোর মাংস খাওয়ার জন্য ছড়ায়, যার মধ্যে এই রোগ ছিল। গাভীর মধ্যে এই রোগ তাদের মাংসৎপাদনার্থ মোটা করার জন্য মাংস খাওয়ানোর জন্য ছড়ায় আর গাভীগুলো মরতে থাকে। যখন তাদের থেকে এই রোগ মানুষের মধ্যে ছড়ায়, তখন নির্দোষ লক্ষ-লক্ষ গাভীগুলোকে নর পিশাচের দল জীবিতই জ্বালিয়ে হত্যা করে। শাকাহারী গাভীকে মাংস

খাওয়ানোর কারণে এই সমস্যা উৎপন্ন হয়। তাহলে কি শাকাহারী মনুষ্যকে অপ্রাকৃতিক আহার মাংস খাওয়ালে রোগ ছড়াবে না? বর্ষ ১৯৯৭ সনে হংকংয়ে মুরগির মাংস ও ডিম খাওয়ার কারণে বার্ড-ফ্লু নামক রোগ ছড়িয়ে ছিল, যার জন্য ১২ লক্ষ মুরগিকে জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়। তারপরেও কয়েকটি দেশে মুরগির হতে বার্ড-ফ্লুর রোগ মাংসাহারীদের উচিত শিক্ষা দেয়, তখন মাংসাহারের ওকালতি কর্তাদের প্রতি দয়াই আসে! কখনও কি শুনেছেন যে দুধ, ফল, শাক, রুটি, ভাত আদি হতে এইরকম সংক্রমণ রোগ ছড়িয়েছে, যার কারণে লোকে দুধ, ফল, শাক, রুটি, ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে?

আমি ফারুক জীর কাছে জিজ্ঞেস করছি যে, যে ব্যাক্তি নিজেকে গর্বপূর্বক মাংসাহারী বলে, সে কি শাকাহারী খাওয়া ছাড়তে পারবে? সে কি রুটি, ভাত, ডাল, শাক, ফলকে পূর্ণতঃ ত্যাগ করতে পারবে? বিশ্বে এমন কোন মাংসাহারী আছে, যে সারাজীবন মাংস ডিমের উপর জীবিত ও স্বাস্থ্য থাকতে পারে? আবার অন্যদিকে সকল শাকাহারী বিনা মাছ, মাংস, ডিমে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। অনেক মাংসভোজীও শুদ্ধ শাকাহারী সাত্বিক ভোজন করে বিনা ওষুধে সুস্থ্য হয়ে যায়। পারবে কি বিশ্বে কোনো ডাক্তার কেবলমাত্র মাংসাহার দ্বারা কোনো রোগের চিকিৎসা করার দাবি করতে? যখন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক জগতে শাকাহারের ক্রান্তি আসছে, নিজের পেটকে কবরস্থান বানানো কারী বড়-বড় মাংসাহারী লোক বা দেশ মাছ-মাংস-ডিম ত্যাগ করছে, সেখানে আপনি কুরআনের রূঢ়িগুলোকে আকড়ে এই মাংসাহারেই বৈজ্ঞানিকতা খুঁজে পাওয়ার অসফল চেষ্টা করছেন। **আপনার কথন হল -**
"উদ্ভিদের মধ্যেও প্রাণ আছে তথা তারা চলা ফেরা করতে পারে না, এই কারণে তারা হল সবথেকে বেশি দয়ার পাত্র, (যদি দয়ার প্রশ্ন শাকাহারীরা উঠায় তাহলে)।"

সমীক্ষা - প্রথমে তো আমি এটা বলবো যে, যদি চলা ফেরা করতে পারে তাদেরই আপনি খেতে চান, তাহলে আমি বলবো যে, বেচারা কথা বলতে পারেনা এমন অজ্ঞানী প্রাণীদের খাওয়ার বদলে বুদ্ধিমান, ধর্মাত্মা ও বৈজ্ঞানিকদের খেলে কেমন হয়, তবে কি বলবেন? বলুন মহাশয়, উচিত হবে তো? আমাদের দৃষ্টিতে যারা যত অধিক কল্যাণকারী এবং বিকশিত প্রাণী হবে, তাকে হত্যা করলে তত অধিক পাপ হবে। বৃক্ষে জীবাত্মা আছে কি নেই, এটা এখনও বিবাদাস্পদ রয়েছে, দুই পক্ষই নিজের-নিজের তর্ক প্রস্তুত করে। আবার যদিও জীবাত্মা হওয়ার পক্ষে শক্ত প্রমাণ রয়েছে। বৃক্ষে যদি জীবাত্মা থাকে তবুও সেটা মহাসুষুপ্তি অবস্থায় হয়ে থাকে, আর এই কারণে তাদের সুখ দুঃখের অনুভব হয় না। বৈজ্ঞানিক বসুর গবেষণার নির্ণয়ে এটাই বলা যেতে পারে যে, তাদের কাটা আদি হতে তাদের উপর এক ক্রিয়া বিশেষ হয়ে থাকে, না কি আমাদের মতো সুখ দুঃখের স্পষ্ট অনুভব। কেউ যদি বলে যে ঘুমন্ত সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাপ্ত মনুষ্যকে অথবা মূর্ছিত (অজ্ঞান) করে মনুষ্যকে মেরে ফেললে কি পাপ নয়? তারও দুঃখের অনুভব একদমই হবে না, এর উত্তর হল এটা যে, মনুষ্যের এই প্রকারের সুষুপ্তি বা অজ্ঞান অবস্থায় তাকে সুচ খোঁচালেই ভঙ্গ হয়ে যাবে, যদি নাও ভাঙ্গে, তবে গভীর আঘাত করলে ভেঙে যাবে আর সে সেই প্রকারের অবস্থায় না সর্বদা ছিল আর

না সর্বদা থাকবে, এই কারণে তার সুষুপ্তির তুলনা বৃক্ষের মহাসুষুপ্তির সঙ্গে হতে পারে না। বৃক্ষের এই অবস্থা স্বাভাবিক তথা স্থায়ী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত এটা বিচার করবেন যে, আমাদের শরীরের রচনা পরমাত্মা শাকাহারের জন্যই বানিয়েছে। বড়-বড় বৈজ্ঞানিক এই কথা স্বীকার করেছে। আপনার এই বিষয়ে এক প্রভাবী তর্ক আছে বটে কিন্তু গম্ভীরতার সঙ্গে বিচার করলে সেটাও বিভ্রান্তিকর সিদ্ধ হয়ে যায়।

• মাংসাহারী ও শাকাহারীর মধ্যে পার্থক্য •

আপনার কথন হল -

"কিছু লোকে বলে যে, খুদা মাংসাহারীদের দাঁত আর নখ দিয়েছে, যা এই কথার প্রমাণ যে সে হল শিকারী, কিন্তু মনুষ্যকে নয়। এই প্রকার বক্তব্যের বক্তা এটা ভাবে না যে, খুদা যে মনুষ্যকে ছিঁড়তে আর ধরতে দাঁত আর নখ দেয় নি কিন্তু তাকে বুদ্ধি তো দিয়েছে, যার দ্বারা সে নিজের উপযোগের জন্য ভালো থেকে ভালো অস্ত্র বানাতে পারে। খুদা পশুদের ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য চওড়া মোটা চামড়া আর বড় চামড়া দিয়েছে, আর মনুষ্যকে তিনি বুদ্ধি দিয়েছেন, যাকে ব্যবহার করে সে নিজের জন্য ভালো থেকে ভালো শাল আর কম্বল তৈরি করতে পারে। পশুর শরীরে উল ও লোম দেখে যদি কোনো মনুষ্য এই পরিণাম খুঁজতে শুরু করে যে, মানুষদের উলের বস্ত্রের উপযোগ করা উচিত নয়, তবে এটা স্পষ্ট যে এইরূপ বিচার বড়ই হাস্যাস্পদ হবে।"

সমীক্ষা - আপনার এই তর্ক অবশ্যই সুন্দর ও প্রভাবী তবে আপনি এটা ভাববেন না যে শাকাহারীদের কাছে কেবল এটাই রামবান রয়েছে। আমাদের কাছে অন্য অনেক প্রকারের শাস্ত্রের অস্ত্র তর্ক রয়েছে, যার থেকে বাঁচার (উত্তর দেওয়ার) দম নেই মাংসাহারীদের।

১. সর্বপ্রথম তো প্রাক্বর্ণিত তর্কগুলো, বৈজ্ঞানিক ও আর্থিক তথ্যগুলোর উত্তর আপনার কাছে হবে না।

২. ঠিক আছে, নখের কাজ না হয় হাতিয়ার করে দিলেন কিন্তু দাঁতের যে রচনা মাংসাহারী ও শাকাহারীদের মধ্যে ভিন্ন রয়েছে, তার কি করবেন আপনি?

দাঁত তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে - কাটার, ধরার বা ছেরার আর পিষে ফেলতে বা চাবানোর জন্য। মাংসাহারীদের মধ্যে কামড়ে ধরার দাঁত অতি ধারালো ও তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে, যেটা আমাদের মানবদের কাছে নেই। মাংসাহারীদের চোয়াল ডানদিক-বাঁদিক সরে না কেবল উপরে-নিচে হতে পারে, যার কারণে তারা নিজের আহারকে পিষে ফেলতে পারে না বরং শুধু চাবাতেই পারে, অন্যদিকে আমাদের দাঁত পিষে ফেলার কাজ করে।

৩. মাংসাহারী পশুদের আমাশয় (Dysentery) প্রায় গোল আর অন্ত্র (intestines) মুখ থেকে ল্যাজের মূল পর্যন্ত দৈর্ঘ্য তিন থেকে পাঁচ গুন পর্যন্ত হয়ে থাকে, অন্যদিকে আমাদের অন্ত্র সম্পূর্ণ শরীর হতে দশ থেকে বারো গুন হয়ে থাকে আর মস্তক হতে মেরুদণ্ডের অন্তিম কেশরুকা পর্যন্ত প্রায় ২৪ গুন। আবার ঘাস ভক্ষণকারী পশুদের মধ্যে প্রায় ২০ থেকে ২৪ গুন পর্যন্ত হয়ে থাকে। আপনি ভাবুন যে আমাদের অন্ত্রগুলো মাংসাহারীদের তুলনায় শাকাহারী পশুদের সঙ্গেই সমানতা রাখে। এখন আপনার মাংসাহার দ্বারা নির্মিত বুদ্ধি আমাদের অন্ত্রগুলোকে ছোট করতে পারবে কি? আমাশয়কে (Dysentery) তো গোল করা যাবে না।
৪. যে শিশু পশুহত্যার বিষয়ে কিছুই শোনে নি, সে যদি বা মাংস খায়, তবুও কোনো মোটা তাজা ছাগল অথবা ভেড়া, মোষকে দেখে লালায়ীত হবে না, অন্যদিকে মাংসাহারী প্রাণী লালায়ীত হবেই।
৫. শাকাহারীদের মধ্যে পাচন মুখ থেকে প্রারম্ভ হয়, অন্যদিকে মাংসাহারীদের পাচন আমাশয় থেকে প্রারম্ভ হয়।
৬. শাকাহারীদের সেলাইবা (Saliva) তে ক্ষারীয় এনজাইম টাইলিন সেলাইবা এমাইলেস হয়ে থাকে, যা স্টার্চকে পচায়, অন্যদিকে মাংসাহারীদের সেলাইবা অম্লীয় হয়ে থাকে।
৭. মাংসাহারী পশু মাংসের সঙ্গে হাঁড়ও খেয়ে ফেলে কিন্তু মানব হাড্ডি খেতে পারে না।
৮. শাকাহারীদের নবজাতক শিশুকে মাংসাহারের উপর জীবিত ও স্বাস্থ্য রাখা সম্ভব নয়। মাংসাহারী পশুদের এবং মহিলাদের দুধও কম বের হয়।
৯. মাংসাহারী রাত্রেও স্পষ্ট দেখতে পায়, তাদের চোখ চকচকে ও গোল হয়ে থাকে, অন্যদিকে শাকাহারীদের চোখ এমনটা হয় না।
১০. শাকাহারী প্রায়ঃ ঠোঁট লাগিয়ে জল পান করে, অন্যদিকে মাংসাহারী জিহ্বা দিয়ে চেটে জল পান করে।
১১. ফুল, পাতা, ফল, ফুলের তোড়া, আদি দিয়ে ঘরকে সাজিয়েই মানুষের চিত্ত প্রসন্ন থাকে, অন্যদিকে ঘোর মাংসাহারীও নিজের ঘর-দ্বার, ফার্নিচারে মাংস, চামড়া, রক্ত, হাড্ডি আদি দ্বারা সাজাতে চাইবে না। এতে সিদ্ধ হচ্ছে যে মানবদের এই পদার্থগুলো থেকে ঘৃণা রয়েছে।
১২. মাংসাহারী পশুদের দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের ভক্ষ্য প্রাণীরা দৌড়ে পালায় আর চিৎকার করে ও চিল্লাতে থাকে, যেমন বিড়ালকে দেখলেই পাখি, কাঠবিড়াল পালায় আর চিৎকার করে ও চিল্লাতে থাকে। অন্যদিকে ফারুক সাহেব! আপনাকে সহজ স্থিতিতে দেখে ছাগল, মুরগা, গাভী, গাধা, মোষ পালাবে না আর না ভয়ভীত হয়ে চিৎকার করবে।

মহাশয়! এই বারো ভেদ তথা পূর্ববর্ণিত ভেদ আপনি বুঝতে পারছেন না? যে কুদরত (প্রকৃতি) বা খুদার উপর এটা আরোপ লাগাচ্ছেন যে, সে পশুদের আমাদের খাওয়ার জন্য বানিয়েছে, তবে সে খুদা কুরআনের মানবকৃত খুদা হতে পারে অথবা হজরত মুহম্মদের আদেশ হতে পারে, না কি সৃষ্টির রচনাকর্তা, পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা পরমেশ্বর। কারণ ঈশ্বরের যদি এটাই স্বীকার ছিল, তবে সে কেন আমাদের শরীরের রচনাটাও মাংসাহারীদের সমান বানায়নি? **আপনি বলেছেন -**

"খুদা বিশ্বে ভোজনের সমস্যা মেটাতে সেটা উদ্ভিদ ভোজনের সমস্যা হোক অথবা প্রাণীদের ভোজনের সমস্যা, এই প্রকার সমাধান বের করেছে যে একে অপরের কাছে ভোজন প্রাপ্ত করে। একের জীবন অন্যের উপর নির্ভরশীল। বিড়াল ইদুরকে ধরে, সিংহ ছাগল, গাভীকে আর হরিণকে, ছোট মাছকে বড় মাছ খায়।"

সমীক্ষা - ধন্য আপনাকে ফারুক সাহেব! নিজের বুদ্ধির ঘিলু বের করে দিয়ে এখন মাছ, বাঘ, কুকুর, বিড়ালদের থেকে আপনি প্রেরণা নিচ্ছেন। পশুদের সঙ্গে মাংসাহারী উদ্ভিদেরও চর্চা করছেন। এই সৃষ্টিতে সকলের ভোজন পরমাত্মাই নিশ্চিত করে রেখেছে আর যেমনটা তার জন্য ভোজন নির্ধারিত করেছে, ঠিক সেরকমই তার শরীরের রচনা করেছে। আপনি মাংসাহারী পশুদের অতিরিক্ত ঘাস আদি ভক্ষণকারী পশু আর ফল ভক্ষণকারী বাঁদর আদি থেকে কেন শিক্ষা পাচ্ছেন না, যেহেতু আমাদের শরীরের রচনা পরমাত্মা তাদের সমানই বানিয়েছে। যদি ভাবেন যে দুইয়ের শিক্ষা নিয়ে উদ্ভিদ ও মাংস-ডিম খেয়ে হাইব্রিড বংশ হওয়া ঠিক হবে, তবে একবার এটাও বলুন যে এই শরীর রচনা ও ক্রিয়া বিজ্ঞানকে কিভাবে হাইব্রিড বানাবেন? বন্ধুবর! একটু ভাবুন! জিদ করা ভালো নয়। হিংসক, ক্রুরদের নিজের গুরু বানাবেন না। মাংসাহারী উদ্ভিদের, ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাসদের উদাহরণ এখানে দেওয়া কিভাবে সঙ্গত হতে পারে? এমনটা নয় তো, সূর্যের উর্জা হতে দ্রব্যমানের ক্ষতির উদাহরণ দিয়ে সামান্য বুদ্ধির পাঠকদের এটা বলতে চাচ্ছেন যে, আপনি বিজ্ঞানের বড় জ্ঞানী! এইসব কথাগুলো সামান্য ছাত্রও জানে। আমি এর উপর চর্চা করে নিবন্ধের আকার বাড়ানোটা অনাবশ্যক মনে করি। মাংসাহারীদের মাংসে হারামের বিষয়ে **আপনার কথন হল** -
"মাংসাহারী পশুদের মাংসেরও বাস্তবে নৈতিক কারণগুলো দ্বারা হারাম মানা হয়েছে। তাদের মাংস নিজের ভিতর পশুর ("পশুতা" শব্দ হবে), জংলীপন আর নির্দয়তা উৎপন্ন করে। স্পষ্ট রূপে মানবতার বিরুদ্ধ।"
অন্তিম দুটি বাক্যের সঙ্গতিই বসে না। এখানে দুটি বাক্য জুড়ে লেখা উচিত ছিল - জংলীপন আর নির্লজ্জতা স্পষ্ট রূপে মানবতার বিরুদ্ধে। এর উর্দ্ধে আপনি লিখেছেন - *"অন্নেরও প্রভাব মনুষ্যের স্বভাবের উপর পড়ে।"*

সমীক্ষা - এখানে একটা সত্য আপনিও স্বীকার করছেন যে, মাংসাহারী প্রাণীরা জংলী, নির্লজ্জ ও নির্দয়ী হয়। তাদের মাংস খেলে পরে তাদের এই দূর্গুণ মনুষ্যের মধ্যেও এসে যেতে পারে, এই কারণে এদের মাংস খাওয়া হারাম (খারাপ)। মহাশয়! আমি জিজ্ঞেস করতে চাইবো যে, বাঘ, কুকুর, শেয়াল আদি গরু, ছাগল, হরিণ, খরগোশ আদিদের খাওয়ার পর নির্দয়ী, জংলী ও নির্লজ্জ হতে পারে, তবে মাংসাহারী মনুষ্য এই প্রাণীগুলোকে খেয়ে বুদ্ধিশালী, দয়ালু ও সজ্জন হয়ে কিভাবে থাকতে পারবে? তাহলে তো এই মাংসাহারী মনুষ্যের তুলনায় গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা এমনকি শুকর পর্যন্ত ভালো হবে, কারণ তারা মাংস না খাওয়ায় উপর্যুক্ত দূর্গুণগুলো থেকে বাঁচতে পারে, আর বেঁচে আছে। হ্যাঁ, শুকর কখনও-সখনও মাংসও খেয়ে ফেলে, তাই তাকে একটু নিম্ন বলা যায়। ধ্যান রাখবেন, মাংসাহারীদের উপর এই দোষ আমি লাগাচ্ছি

না বরং আপনার তর্কই লাগাচ্ছে। আমি তো আপনার বিচারগুলোর পর্দা-ফাঁসই করছি, এরসঙ্গে আমিও একমত আছি।

• মাংসাহার ও দয়া •

আপনি লিখেছেন -
"এই সৃষ্টিতে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সিদ্ধান্তও চলছে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে রোগীর আর আরামের সঙ্গে কষ্টেরও নিয়ম দেখা যায়। মনুষ্যকে বিশ্বে পরিশ্রমের মাঝে রাখা হয়েছে। যদি মানব জীবন খুদার দয়ার পরিচায়ক হবে, তাহলে মৃত্যুতেও দয়া কার্যশীল হবে। মৃত্যু হতে বাস্তবিক জীবনের দ্বার খুলে যায়।
আশ্চর্যের কথা হল যে, যেসব প্রাণী রোগের কারণে মৃত্যু প্রাপ্ত করছে, তখন কেউই এমনটা বলে না যে - খুদার ব্যবহার প্রাণীদের প্রতি নির্দয়ী হচ্ছে, তিনি জীবধারীদের মৃত্যুকষ্ট থেকে মুক্ত রাখেননি, কিন্তু যদি এই একই কষ্ট মাংস প্রাপ্ত করার হেতু নেওয়া হয়, তখন তার উপর আক্ষেপ করা হচ্ছে। যখন কাটার সময় কষ্ট হয়, এখানে সামান্য রীতিতে মৃত্যু হতে বেশি কষ্ট হয়ে থাকে..."
(এইভাবে উল্টো-পাল্টা অনেক কিছু লিখে নিজের জ্ঞানের প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হয়েছে।)

সমীক্ষা - এটা তো সত্য যে সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ সাথে-সাথে চলে কিন্তু ঈশ্বর যদি কাউকে মারে তো তাকে জন্মও তিনি দিয়ে থাকেন। এই কারণে তার মারার অধিকারও রয়েছে। ঈশ্বর হল ন্যায়কারী ও কর্মফলপ্রদাতা, এই থেকে তিনি সকল প্রাণীদের কর্মানুসার সুখ দুঃখ, জীবন মরণের ফল দেন, তবে আপনারা ছাগল, মুরগী, গাভী আদি নিরীহ পশুদের খেয়ে-খেয়ে নিজেদের পেটকে কবরস্থান বানাতেই শুধু শিখেছেন না কি কোনো মৃত পশুদের জীবিতও করতে পারেন? যদি না পারেন, তবে মারার অধিকারটা আপনাকে কে দিলো? নিজেকে খুদার সমানতা কেন করতে লাগলেন? তিনি তো সৃষ্টি রচনা, পালন, ধারণ, প্রলয়কর্তা কিন্তু আপনারা তো পশুদের হত্যা করে খেয়েই খুদা হয়ে বসে আছেন। ধন্য আপনাকে ফারুক জী! আমি জিজ্ঞেস করছি যে, খুদা কি মনুষ্যকে মারে, কষ্ট দেয়? যদি হ্যাঁ, তবে দয়ালু মহাশয়! নিজের সন্তান, মাতা-পিতা, আত্মীয় পরিজনদের মেরে খেয়ে ফেলে তাকেও নিজের দয়ার প্রসাদ দিয়ে বাস্তবিক জীবনের রাস্তা দেখিয়ে দিন। ফারুক জী! আপনি তো হলেন অনেক দয়ালু যে, বেচারা দুর্বল পশু-পাখিদের, কথা বলতে পারে না এমন পশুদের গলার উপর ছুরি চালান, তাদের ধীরে-ধীরে কেটে খেয়ে খুদার প্রিয় ন্যায়ী মৃত্যুর সঙ্গে সমানতা মেলান। এই মিথ্যা জীবন হতে মুক্তি দিয়ে বাস্তবিক জীবনের উপহার দেন আর এমনটা করে খুদার অনিবার্য নিয়ম পালনে খুদার সহযোগ করেন। কিন্তু মোহম্মদ ফারুক জী! আপনি কত

নির্দয়ী, নিজের পরিবার ও সমাজকর্তাদের প্রতি যে এদের রোগী, গরীব, দুঃখী দেখেও মৃত্যুরূপী প্রসাদের স্বাদ করান না। সে বেচারা এমনি স্বাভাবিক মৃত্যুর দুঃখ ভুগতে থাকে। বেচারা খুদা একটা-একটা করে সকলকে মারতে কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু আপনার না তো খুদার প্রতি দয়া আসে যে, সব মোমিনদের মারার মধ্যে কষ্ট বইতে হয়। পশু ও পাখিদের মারার কাজ তো আপনি নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন কিন্তু মনুষ্যদের হত্যার কাজটা বেচারা খুদারই রইলো। আপনার মতো পরোপকারী, ধর্মাত্মা, দয়ালু কোথায় পাওয়া যাবে যে, সকল পশুর উপর কৃপার বর্ষা করে জান্নাতে পাঠানোর ঠেকেদার হয়েছেন, তবে নিজেদের জন্য দোজখ্ই স্বীকৃত। আপনি খুদা আর খুদার হাতে (রোগী, বৃদ্ধাবস্থা আদির মাধ্যমে) কষ্ট দিয়ে-দিয়ে মারার জন্য নিজের পরিজনদের ছেড়ে দিয়েছেন আর স্বয়ংও সেই কষ্টকে নেওয়ার জন্য তৈরি আছেন। আপনিও ছাগলের মতো কুরবানীর জন্য তৈরি হলে কেমন হবে? ধন্য আপনাকে তর্কশাস্ত্রীন্! এরকম বিচিত্র ও মিথ্যা কুতর্ক আপনার হয়তো মাংস, ডিমাদি খেয়েই মাথায় এসেছে। মহাশয়! কুরআন তো বৃদ্ধ, বাচ্চা, অনাথদের ভালোবাসতে শেখায়, মনুষ্যদের মধ্যে মোমিনদেরই ভালোবাসতে শেখায়, কিন্তু আপনি এদের উপেক্ষা করে ছাগল, মুরগিদের সঙ্গেই ভালোবাসা করার কথা বলছেন। আপনি মৃত্যুকে আল্লার মহান প্রতীকের মধ্যে একটা প্রতীক বলছেন। দুঃখের বিষয় হল যে, এই মহান প্রতীক হতে স্বয়ংকে বঞ্চিত রাখছেন। পায়ে কাঁটার খোঁচা লাগতেই ঝাপিয়ে ওঠেন, রোগ হলেই চিকিৎসালয়ে চলে যান, আগুনে হাত লাগতেই হাহাকার শুরু করেন, কিন্তু নিজের গলা কাটানোর জন্য তৈরি হচ্ছেন না, যার দ্বারা বাস্তবিক জীবন প্রাপ্ত করতে পারবেন, অন্যদিকে পশুদের কেটে রান্না করে খেয়ে ফেলতে দয়ার কথা বলছেন। বড় দুঃখ হয়, আপনার মতো যারা নিজেকে বুদ্ধিজীবি বলে এমন ঢংকারী মাংসাহারীদের উপর। স্বাদের এত গুলামী করা ছাড়ুন। মজহবের উন্মাদকে বুদ্ধির চকচকে চাদর দিয়ে ঢাকার চেষ্টা বন্ধ করুন, পরমাত্মা হতে ভয় করুন।

আপনি বলেছেন -

"মৃত্যুতে নিজের জন্য অসংখ্য লাভ আছে। বিশ্বে যত হানিকারক জন্তু জানোয়ার আর কীটাণু দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে নিজের জন্য অনেক প্রকারের বোধ সামগ্রী উপস্থিত আছে - নিজের পশুদের আল্লার মহানতার উপর ছেড়ে দাও - বন্ধনের দাবি উঠছে।"

সমীক্ষা - এটা সত্য যে আত্মরক্ষার জন্য এবং সার্বজনিক হিতার্থে হানিকারক প্রাণীকে দণ্ডিত করা যেতে পারে, তবে এটাও সত্য যে আমাদের মতো অন্য প্রাণীদেরও বাঁচার অধিকার রয়েছে। হানিকারক হিংসক পশুদের মেরে ফেলাও মর্যাদার ভিতর রাজার অধিকার রয়েছে। কিন্তু নিরীহ ও নির্বোধ প্রাণীদের হত্যা করে খেয়ে জিহ্বার তৃপ্তি করাটা হল ভিন্ন প্রকারের প্রচণ্ড কুকর্ম। আপনার মান্যতা হল যে আল্লার প্রতি নিজের প্রিয় বস্তুটি ভেট করা উচিত, তাহলে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে, ছাগলকে তো আপনি জন্ম দেননি, তো তাকে বলি দেওয়ার অধিকারটা আপনাকে কে দিল? আর ছাগলটি কি আপনার নিজের শরীর অথবা আপনার আত্মীয়দের থেকেও কি প্রিয়? যদি না, তবে আপনি তাদের অথবা নিজের বলি কেন দেন না? আপনি পূজা করছেন আর পশুটা ছটফট করছে, মারা যাচ্ছে, যেহেতু সেও সেই খুদারই জন্ম দেওয়া,

তারই সন্তান, এটা কেমন ঘোর কুকর্ম করছেন? যদি খুদা মাংস আর লহূই (রক্তই) চায় আর এইভাবে কোনো হিন্দু দেবী দেবতাও যদি ভোজন চায়, তো তিনি সকলকে কি হত্যাই করবে, তবুও তার পেট ভরে না? খুদা বা ভগবান যদি ক্ষুধার্ত হন তবে তিনি স্বয়ংই মেরে নেবেন, আপনি কেন এই কাজ নিজের মাথায় নিয়েছেন? আপনার কুরআন তো এটাও বলে যে -
"খুদার কাছে না তো তাদের গোস্ত (মাংস) পৌঁছায় আর না খুন (রক্ত), বরং তার কাছে তোমার সংযমশীলতা পৌঁছায়।"

আপনি বলুন, আপনি পশুদের খুদার জন্য হত্যা করেন নাকি নিজের স্বাদের তৃপ্তি করার জন্য? আরে মহাশয়! খুদাকে প্রসন্ন করতে চান তো অন্যায় থেকে বিরত থাকুন, খুদার সন্তানদের উপর দয়া করতে শিখুন। তাদের দুঃখকে নিজের দুঃখের সমান ভাবুন। মানবমাত্রকে ভাই ভেবে ব্যবহার করুন। যদি স্বাদকেই প্রসন্ন করতে চান, তবে পরমাত্মার তৈরি করা দুধ, ঘৃত, ফল, মাখন, বাদাম, অন্ন আদি উত্তমোত্তম পদার্থ প্রেমের সঙ্গে খান।

আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনি পশুদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদনকে ধর্ম বলেই প্রাণীদের প্রতি দয়ালুতার উদাহরণও দিচ্ছেন। এই দু-মুখো চরিত্র মোটেও ভালো নয়। আপনার অনুসারে কুকুরের প্রতি দয়া করে এক ব্যভিচারী স্ত্রী মোক্ষ পাচ্ছে আর সর্বপকারক গাভীকে হত্যা করে মোক্ষের মার্গ বলছেন। কুকুরকে বাঁচানো আর গাভীকে হত্যা করা সমান-সমান হয়ে গেল? তাহলে তো আপনাকে গাভীর নয় কুকুরের দুধ পান করা উচিত, কারণ তাদের পালনে মোক্ষও পেয়ে যাবেন আর পান করার জন্য সুন্দর মিষ্টি দুধও, সঙ্গে কুত্তী ঘরের পাহারাও দিবে, সেটা আবার আলাদা লাভ। বন্ধুবর! এটা যদি বলেন তবে ঠিক হবে যে, প্রাণীমাত্রের উপর দয়া করলেই খুদা প্রসন্ন হবে।

আপনার কথন হল -

"জবহ করার জন্য (পশু হত্যার জন্য) ধারালো ছুরি হোক, যাতে কম থেকে কম কষ্ট পায়।"

আমি তো শুনেছি হিন্দু কসাই পশুদের এক ঝটকায় মেরে ফেলে যাকে "ঝটকা" আর মুসলমান ধীরে-ধীরে গলা কাটাকে "হালাল" বলে। তাদের ঝটকে হত্যা করা পশুদের মাংস খাওয়াও আপনার পছন্দ নয়, তাহলে এটা আপনি কথা থেকে লিখলেন? আমি এটা মোটেও বলছি না যে হিন্দু কসাই ভালো আর মুসলমান কসাই মন্দ। দুইজনই হল পাপী, তাহলেও যে যত কষ্ট দিয়ে হত্যা করবে সে হবে ততই অধিক ক্রুর ও পাপী। **আপনার কথন হল -**

"এই জঙ্গল উৎপন্নের মুখ্য উদ্দেশ্য হল মনুষ্য, না কি পশু। যদি মনুষ্যকে সৃষ্টি থেকে আলাদা রাখা যায়, তবে এই বিশ্ব একদম অন্ধকারময় হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ আকর্ষণ এবং প্রিয়তা আর এমন কি সকল সাজ সজ্জার পদার্থ মনুষ্যের বিনা নিরর্থক হবে। এক মনুষ্যেরই অস্তিত্ব আছে যার উপর সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থে সার্থকতা আর উদ্দেশ্যতার আত্মা দৌড়াচ্ছে, বিশ্বের সকল বস্তু কেবল মনুষ্যের জন্য উৎপন্ন করা হয়েছে, খুদার

নেমতকে (কৃপাকে) হারাম (খারাপ) বলাটা, স্বয়ং একটা বড়ই অপরাধ হবে, যার প্রতি লোকের ধ্যান নেই। মাংসাহারের বিরোধ করা মানে খুদার এক বড় কৃপাকে অস্বীকার করা হবে। খুদা মানুষের লাভের জন্য, পশুদের তৈরি করেছে, তাই তাদের থেকে সম্পূর্ণ লাভ উঠানোর অধিকার প্রাপ্ত করা যেতে পারে।"

সমীক্ষা - এটা তো সত্য যে মনুষ্য হল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। এই বিশ্ব মুখ্যতঃ মনুষ্যেরই জন্য। বেদও এর সমর্থন করে - **"তুভ্যম্ ভুবনানি তাস্থিরে তুভ্যমর্ষন্তি সিন্ধবঃ"** (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ হে মনুষ্য! তোমাদের জন্যই এই লোগ দাঁড়িয়ে আছে। তোমাদের জন্যই নদী প্রবাহিত হচ্ছে। মনুষ্যকে সকল প্রাণীর রাজা বললেও অনুচিত হবে না, কিন্তু রাজা কি তাদের বলবে, যারা প্রজাদের মেরে খায়? পিতার কর্তব্য কি এটা যে সে তার সন্তানদের খাবে? না, কখনও না। রাজা ও পিতা দু'জনেরই কর্তব্য হল যে, সে তার প্রজা অথবা সন্তানদের পালন আর রক্ষা করবে। মনুষ্য ভোগ তথা কর্মের অধিকারী রাখে, আর একেই নিচ কর্মের আধারে অন্য প্রাণীদের রূপে জন্ম নিতে হয়। যেখানে ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্যের না তো বোধ থাকে আর না আবশ্যকতা। এই যোনিগুলো জীবাত্মার জন্য কারাগারের সমান। যতক্ষণ শুভাশুভ কর্ম এক সন্তুলন বিশেষ প্রাপ্ত না করছে, ততক্ষন সেই যোনিগুলোতে থাকতে হয়। পুনঃ মনুষ্য যোনিতে আসে অবশ্যই। কিছু দুধ হেতু, কিছু উল, কৃষি আদির জন্য, স্বাভাবিক মৃত্যুতে চর্মের জন্য বানানো হয়েছে, কিন্তু তাদের মেরে খাওয়ার জন্য তো বাঘ, কুকুর, বিড়ালও বানিয়েছে। বন্য পশু পরিবেশ রক্ষাতেও সহযোগ হয়ে মানব জাতির জন্য পরোক্ষ সহযোগ করে থাকে। কিছু হানিকারকও রয়েছে, তারা পাপের দণ্ড দেওয়া হেতুও মানা যেতে পারে, তাহলেও আত্মরক্ষার্থে আপত্তিকালে তাদের হত্যাও করা যেতে পারে, কিন্তু খাওয়ার জন্য মোটেও নয়। কেবল এদেরই নয় বরং মারতে আসা হত্যাকারী মনুষ্যকেও বধ করা যেতে পারে, কিন্তু সেটাও খাদ্যের জন্য নয়। যদি আপনি মনে করেন যে, কুরআনে খুদা বলেছে যে, মাংস খাওয়ার জন্য পশু বানানো হয়েছে, তবে আপনার খুদা সেইরকম শরীর বানাতে কেন ভুলে গেছে? এখন পর্যন্ত খুদার ভুল বরাবর চলে আসছে। আপনার উচিত যে, ইবাদত (প্রার্থণা) করার সময় খুদাকে বলা যে, "হে খুদা! আপনি আমাদের জন্য ভোজ্য পদার্থ তো বানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু অন্ত্র ছাগল, গাভী, বাঁদরের মতন বানিয়েছেন। ও ভুলা খুদা! এখন তো ভুল সুধার করুন অথবা এটা বলেদিন যে, কুরআন আমি তৈরিই করিনি, এটা তো মোহম্মদ সাহেবের কল্পনা ছিল। যখন কুরআন আর সৃষ্টির মধ্যে তালমেলই নেই তো কুরআন খুদার পুস্তক রইল কোথায়? এটা অন্য বিষয় হবে তাই এখানে চর্চা করা উচিত ও আবশ্যক হবে না, তবুও আপনি যদি খুদার রচনা কুরআনকেই মানেন, তবে খুদাকে বলবেন যে, হে খুদা! আপনার ভুলের কারণে বড় বড় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ মাংসাহারের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা দিচ্ছে। সঙ্গে এটাও জিজ্ঞেস করবেন যে, মোটা তাজা শুকরগুলোকে আপনি কেন বানিয়েছেন? কেবল কি শুধুমাত্র নোংরা সাফ করার জন্যই, তবে তারমধ্যে চর্বির ভান্ডার অন্য প্রাণীদের তুলনায় অধিক কেন ভরে দিয়েছেন? মাংসাহারীদের জিহ্বা নাচায়, কিন্তু খুদা হারামও বলেদিয়েছে। বন্ধু, ধ্যানে রাখবেন! পরমাত্মার প্রত্যেক বস্তু খাওয়ার জন্য বানানো হয়নি। সকল প্রাণীদের ভিন্ন-ভিন্ন সর্বহিত উপযোগ রয়েছে, কেবল মানব হিতার্থে নয়। খুদা তো বিষও বানিয়েছে, বলুন ফারুক জী! তবে কি সেটা

খেয়ে মরে যাবেন? নোংরাও বানিয়েছে, কীটপতঙ্গ, মশা, মাছি, গুব্রেপোকা বানিয়েছে, তবে কি সবগুলো খাওয়া যাবে? একটু বিজ্ঞানের গম্ভীরতা তথা ধর্মের রহস্যকে বোঝার চেষ্টা করুন। পরমাত্মার সুন্দর ও বিবেকপূর্ণ রচনার উপর বিচার করুন। স্বয়ং খুদা হয়ে মালিক হওয়ার দুঃ সাহস করবেন না। মনুষ্যের অধিকার হল পরমাত্মার আজ্ঞা পালন করে, তার উপাসনা করা নাকি স্বয়ং পরমাত্মা হওয়া।

আপনি ছাগলকে কাটার তুলনা সার্জনের সার্জারির সঙ্গে করছেন, এটা মহামূর্খতা হল কি না! ডাক্তার তো কারোর রোগমুক্ত করার হেতু কাট-ছাট করে থাকে, না কি কেটে খাওয়ার জন্য, অন্যদিকে মাংসাহারী শয়তান ডাকুদের মতো প্রাণীদের নির্মম হত্যা করে নিজের পেট ভরে। এরকম তুলনা করার বুদ্ধিও মাংসাহার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়ে থাকবে। এমন ডাক্তারি করতে, আপনি কেবল দুর্বল পশুদেরই পেয়েছেন, নিজের আর নিজের পরিজনদের এরকম সার্জারি করুন না, তখন আপনি জানবেন দয়া আর ক্রূর্তার পরিভাষা কি আর দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

• প্রাচীন ইতিহাস এবং মাংসাহার •

আপনার কথন হল -
"ইতিহাস হতে এটা প্রমাণিত যে, মনুষ্য মাংসের উপযোগ ভোজন রূপে করে এসেছে। বৈদিক কালে ভারতবর্ষের লোকেরা মাংস খেতো। তীর ধনুক দিয়ে পশুদের শিকারের প্রচলন ছিল। রামচন্দ্র জীকে সীতা জী দ্বারা হরিণ শিকারের জন্য আগ্রহ করা আর তার হরিণের শিকার হেতু বাইরে যাওয়া, এটা তুলসীদাস জীর বর্ণন থেকে প্রমাণিত। সেইরকম রাজা দশরথ হরিণ ভেবে শ্রবণকুমারকে তীর মারাটাও নির্বিবাদ রূপে সত্য মানা হয়েছে।"

সমীক্ষা - মাংসাহারের কথাটাকে কিসের আঁধারের উপর মানব ইতিহাসের অনিবার্য অঙ্গ মানছেন? বৈজ্ঞানিক আঁধারের উপর আমরা চর্চা করেই ফেলেছি। আপনি বলেছেন যে, মনুষ্যকে খুদা হাতিয়ার (অস্ত্র) বানানোর বুদ্ধি মাংস খাওয়ার জন্যই দিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করছি যে, আপনার বাবা আদম আর হব্বাকে যখন খুদা তৈরি করে, তখন তাদেরকেও ছুরি তরোয়াল উপহার করেছিল কি করেনি? খুদা তাদের একটি বৃক্ষ বিশেষের ফল খেতে নিষেধ করেছিল? এর অর্থ এটা হল যে, অন্য ফল খেতে নিষেধ করেনি। এতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আদম আর হব্বা ফলাহারী ছিল, নাকি মাংসাহারী। খুদা তাদের এটা তো বলেনি যে, শুকর খাবে না, মুরগা খাবে আদি। এটা তো হল মুহম্মদ সাহেবের জিভের কামাল। এখন কোন ফলের নিষেধ করেছে, এটা তো আপনি তথা আপনার খুদা বা শয়তান জানবে। আমাদের আশয় হল এটা যে, মনুষ্য

ফলাহারীই ছিল। অন্ন, দুধ আদি খাওয়া পরে শুরু হয়, কিন্তু অনেক পরে নয়। হ্যাঁ, মায়ের দুগ্ধ তো প্রাথমিক তথা অনিবার্য ভোজন। পরমাত্মার পশ্চাৎ মানুষমাত্রকে প্রথম ধর্মোপদেষ্টা ভগবান্ মনু মাংসাহারে একটা নয় বরং আঠ পাপী বলেছেন।

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সম্স্কর্তা চোপহর্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ।

(মনুস্মৃতি ৫.৫১)

অর্থাৎ - যে হত্যার অনুমতি (পরামর্শ) দেয়, যে মাংস কাটে, যে পশুহত্যা করে, যে পশুকে হত্যার জন্য লইয়া যায় ও বিক্রয় করে, যে মাংস রন্ধন করে, যে মাংস পরিবেশন করে ও যে মাংস ভক্ষণ করে সেই সমস্ত ব্যক্তিই ঘাতক হিংসক, ইহারা সকলেই পাপী। এই হল আট প্রকারের ঘোর পাপী। যখন মানব ইতিহাসের প্রারম্ভ বেদজ্ঞান ও মনুর উপদেশ দ্বারা প্রারম্ভ হয়েছে, তো সেখানে মাংসাহারের স্থান কিভাবে পেতে পারে? হ্যাঁ, ম্লেচ্ছ, অসুর, রাক্ষস আদি লোকে ধীরে-ধীরে পথভ্রষ্ট হয়ে মাংসাহারের দিকে আকৃষ্ট হয়। আর্যদের (শ্রেষ্ঠ মনুষ্যদের) সঙ্গে এই মাংসাহারী প্রায়শই সংঘর্ষ হয়ে থাকতো। আপনি শ্রীরামের উদাহরণ দিয়ে মাংসাহারের ঐতিহাসিকতা এবং ঔচিত্যকে সিদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণের উপর গম্ভীর বিচার করা আবশ্যক রয়েছে। যখন মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপে সীতা জী দর্শন করেন আর তিনি শ্রীরাম জী তথা লক্ষ্মণ জীকে সেটা দেখান, দেখার সঙ্গেই লক্ষ্মণ জী বলেন -

অহম্ মন্যে মারীচম্ রাক্ষসম্ মৃগম্
অনেন নিহতা রাম রাজনঃ কামরূপিণা।

(অরণ্যকাণ্ড ৩৪| ৫,৬)

অর্থাৎ - এটা মৃগের রূপে রাক্ষস মারীচ এসেছে, আমি এমনটা মনে করছি। এই ইচ্ছাধারী রাক্ষসটি অনেক রাজাদের বধ করেছে। সীতা জী তাকে জীবিত ধরে আনতে আগ্রহ করেন, না কি মেরে আনতে বলেন। যদি বলেন যে, জীবিতই ধরা উচিত ছিল, তবে ধনুষ বাণ সঙ্গে নেওয়ার আবশ্যকতা কেন ছিল? এই বিষয়ে আমি মনে করি যে, মৃগকে দৌড়ে হাতে ধরা সম্ভব না, বরং মোহনাস্ত্র (অজ্ঞান করা) আদি দ্বারা বেঁধেই আনা সম্ভব হতে পারে। এই কারণে ধনুষ বাণ সঙ্গে করে নিয়ে যান। এছাড়া ক্ষত্রিয়কে নিরস্ত্র, নিঃশস্ত্র থাকাটাও উচিত নয়। এছাড়া ওনাদের আশঙ্কাও ছিল যে, মৃগটা মারীচ, তখন তো সশস্ত্র হয়ে যাওয়াটা অনিবার্যই ছিল। যদিও বাল্মীকি রামায়ণে তাকে জীবিত না ধরতে পাওয়ার স্থিতিতে মেরে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে আর তার হেতু এটা দেওয়া হয়েছে যে, সীতা জী তার চর্ম দ্বারা আসন বানাতে চেয়ে ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করছি যে, যদি চর্মের আসন এবং শয্যাতেই প্রীতি হতেন, তবে স্থানে-স্থানে পত্র, ঘাস, পুষ্পের শয্যা বানাতেন না। ওনারা কি জঙ্গলে কোথাও কোনো সুন্দর পশুর দেখাই পাননি। এত সুন্দরও যদি না পান, তবুও জঙ্গলে অনেক সুন্দর হরিণ, বাঘ, চিতা আদি সুন্দর চর্মওয়ালা পশুর দেখা হয়েই থাকবে। তখন কেন তাদের চর্মের জন্য কাউকে মারেনি? শ্রীরাম অনেক স্থানে লক্ষ্মণ জীকে ফুল, ঘাস, কাষ্ঠ, পত্র নিয়ে এসে শয্যা বানানোর আদেশ দিয়েছেন। কেন কোন পশুকে মেরে চর্ম নিয়ে আনতে আদেশ দেননি? তার থেকে আরামদায়ক

শয্যা, আসন হতে পারতো। যখন শ্রীরাম জী সেই মৃগের পিছু নিতে উদ্যত হন, তখন তিনি লক্ষ্মণ জীকে বলেন -

য়দি বায়ম্ য়থা য়ন্মাম্ ভবেত্ বদসি লক্ষ্মণ।
মায়ৈষা রক্ষাসস্যেতি কর্ত্তব্যোঽস্য বধো ময়া।।
এতেন হি নৃশংস্যেন মারীচেনা কৃতাত্মনা।
বনে বিচরতা পূর্বম্ হিংস্সিতা মুনি পুংগবাঃ।

(অরণ্যকাণ্ড ৩৪| ৩৮,৩৯)

অর্থাৎ - হে লক্ষ্মণ! তুমি আমাকে যেমনটা বলছ, যদি তেমনটাই এই মৃগটি হয়, যদি রাক্ষসী মায়াই হয়, তবে একে হত্যা করা আমার কর্তব্য। কারণ এই শয়তানটি মুনিদের হত্যা করেছে। এতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, শ্রীরাম জী সেই পশুটিকে মারীচ ভেবেছিলেন, না কি স্বর্ণমৃগ। আমাদের এটা ভাবা উচিত যে, লক্ষ্মণ জী ওনার সঙ্গে সেবা হেতুই এসেছিলেন, তিনিই স্থানে-স্থানে কুঠী ও শয্যা তৈরি করতেন, জল, কন্দ, মূল, ফল নিয়ে আসতেন। তখন যদি সেই পশুই ধরা বা মারার হত, তবে কি এই কাজ লক্ষ্মণ জী করতে পাড়তেন না? যেই লক্ষ্মণ জী বড়-বড় যোদ্ধাদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলেন, তিনি সেই মৃগকে মারতে বা ধরতে পারতেন না? তবে কেন শ্রীরাম এই সাধারণ কার্য করার জন্য স্বয়ং গেলেন আর লক্ষ্মণ জীকে সেখানে সীতা জীর রক্ষায় নিযুক্ত করেছিলেন? কেন তিনি সর্বদা সেবাতৎপর অনুজ লক্ষ্মণ জীকে এই কার্য করতে দেননি? এতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, শ্রীরাম জী স্থিতির গম্ভীরতা বুঝে ছিলেন। মারীচের পরাক্রম ও মায়াকে জেনে, লক্ষ্মণ জীকে পাঠিয়ে, তাকে সংকটে ফেলতে চাননি। তিনি গম্ভীর পরিস্থিতিতে নিজের পৌরুষত্বের বিশ্বাস রাখতেন। এই প্রকারের স্থিতি সেই সময়ও এসেছিল যখন খর আর দূষণ ১৪ সহস্র রাক্ষসের সেনা নিয়ে আক্রমণ করেছিল। সেই সময় শ্রীরাম জী লক্ষ্মণ জীকে যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে স্বয়ংই যুদ্ধে নেমে ছিলেন আর লক্ষ্মণ জীকে সীতা জীর রক্ষার্থে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই প্রকার এখানেও সেই পরিস্থিতি হয়েছিল। এসবের উপর গম্ভীরতার সঙ্গে বিচার করলে পরে এটা সিদ্ধ হচ্ছে যে, শ্রীরাম জী শিকার হেতু নয় বরং তাকে মারীচ জেনেই প্রচণ্ড যুদ্ধ করার জন্য গিয়েছিলেন।

আমরা এই বিষয়ের যথার্থতা জানার হেতু রামায়ণের অন্য প্রসঙ্গের উপরেও যদি দৃষ্টি ফেলি, তবে পাই যে, সেই কালে কোনো প্রকারেই হিংসা হত না, কেবল শয়তান দমনার্থ যুদ্ধকে বাদ দিয়ে। যেসময় মহাত্মা ভরত জী চিত্রকুটে শ্রীরাম জীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন শ্রীরাম জী দেখার সঙ্গেই কুশলক্ষেরম জিজ্ঞেস করার সঙ্গে রাজনীতির উপদেশ করেছিলেন। সেখানে এক বিন্দু আসে, যেখানে অযোধ্যা **"হিংস্সাভিরভিবর্জিতঃ"** বলেছেন। (অযোধ্যাকাণ্ড ১০০ সর্গ, শ্লোক ৪৪)

অর্থাৎ - অযোধ্যা হিংসা হতে পূর্ণ মুক্ত ছিল, তাহলে শিকার করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? যখন শ্রীরাম জীর রাজতিলক হওয়ার ছিল, তখন মহারাজ দশরথ জী শ্রীরাম জীকে উপদেশ দেওয়ার সময় ১৮ ব্যসন থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন, এই ১৮ ব্যসন ভগবান্ মনুপ্রোক্ত কামজ ও ক্রোধজ ব্যসন ছিল, যেখানে

শিকার খেলা রাজাদের জন্য প্রথম দুর্ব্যসন বলা হয়েছে। তাহলে শ্রীরাম জী ও দশরথ জীর শিকার খেলা, হিংসা করা কিভাবে সিদ্ধ হতে পারে? এখন যদি কেউ এরকম প্রশ্ন করে যে, যখন শ্রীরাম জী শিকার খেলতেনই না তবে ওনাকে উপদেশ দিয়ে নিষেধ করার আবশ্যকতা কি ছিল? তার উত্তর স্বয়ং দশরথ জীর বচন দ্বারাই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন -

কামতস্বম্ প্রকৃত্যৈব নির্ণীতো গুণবানিতি।
গুণবত্যপি তু স্নেহাত্ পুত্র বক্ষ্যামি তে হিতম্।।

(অযোধ্যাকাণ্ড ৩|৪১)

অর্থাৎ - যেহেতু তুমি স্বভাবেই গুণবান্ আর তোমার বিষয়ে সকলের এটাই নির্ণয়, তবুও আমি স্নেহবশ সদ্গুণসম্পন্ন হওয়ার পরেও তোমায় হিতের কথা বলছি। এতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, শ্রীরাম জীর মধ্যে উপযুক্ত ব্যসন না হওয়ার পরেও পিতা হওয়ার হেতু উপদেশ করাটা কর্তব্য ভেবেই এমনটা বলেছিলেন। যদি শ্রবণকুমারের কথনের আশ্রয় নিয়ে শিকারের কথা সিদ্ধ করা হয়, তবে প্রথম তো এটা নিবেদন করছি যে, তিনি হরিণের ভুলে শ্রবণকে মেরে ছিলেন, এই কথা স্পষ্ট করছে যে, আপনি রামায়ণ তথা রামচরিতমানস দুটোই পড়েননি, অন্যথা হাতীর স্থানে হরিণ বলতেন না। রামচরিতমানসে এই কথার সংকেত মাত্র রয়েছে, অন্যদিকে বাল্মীকি রামায়ণে বিস্তারপূর্বক রয়েছে। এখানে দশরথ জীকে "ব্যায়ামকৃতসম্কল্পঃ" বলা হয়েছে। এতে প্রতীত হচ্ছে যে, ব্যায়াম অথবা ধনুর্বিদ্যার অভ্যাস হেতুই তিনি সরযূ নদীর কিনারে যান, না কি মাংসের জন্য। এখানে লেখা আছে -

নিপাতে মহিষম্ রাত্রৌ গতম্ বাভ্যাগতম্ মৃগম্।
অন্যদ্ বা শ্বাপদম্ কিচিজ্জিঘাম্সুর জিতেন্দ্রিয়ঃ।।

(অযোধ্যাকাণ্ড ৬৩|২১)

এখানে মহিষ, হাতী, মৃগ তথা শ্বাপদ, এই চারের অনুমান লাগানো হয়েছে। এখানে সামান্য অর্থ নিয়ে দেখলে পরে মহিষ, হাতী, মৃগ (যদি হরিণ মানা হয়) তবে অহিংসক রয়েছে। অন্যদিকে শ্বাপদ অর্থাৎ বাঘ হল হিংসক পশু, তাহলে এদের পরস্পর সমান্তা বসে না। এই কারণে এই চারকেই হিংসক মানতে হবে। মহিষ - জংলী মোষ উপদ্রবী হয়েই থাকে, হাতীও মদোন্মত হতে পারে, কিন্তু হরিণকে উপদ্রবকারী মানা যেতে পারে না, তাহলে মৃগের অর্থ বাঘ সমীচীন হবে। এতে সিদ্ধ হচ্ছে যে, দশরথ জী এই উপদ্রব ও হিংসক পশুদের মারার বিষয়ে ভাবছিলেন, তবুও এমনটা ভেবে নিজেকে অজিতেন্দ্রিয় বলেন অর্থাৎ সেই কর্মকে পাপ তথা রাজাদের সর্বোপরি গুণ জিতেন্দ্রিয়তার প্রতিকূল মেনে নিন্দনীয় অনুভব করছেন। এতে বোঝা যায় যে, শিকার খেলা সেসময় প্রচলিত ছিল না, বরং তাকে খারাপ মানা হত। ধনুর্বিদ্যার অভ্যাস বিনা কাউকে মেরে করা হত। এমন হিংসক ও উপদ্রবী পশু, যা জন সামান্যের জন্য সংকট তৈরি করতো, তাদেরই মারার জন্য রাজা অধিকার দিতো। দশরথ জী বিনা সংকটেই মারার বিচার করেন বা মেরেছেনও, এই কারণে নিজেকে অবগুণী বলছেন।

আমি মানছি যে রামায়ণ ও মহাভারতে অনেকত্র শিকার খেলার বর্ণন এসেছে। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাইবো যে, এরকম সব প্রসঙ্গগুলো মধ্যকালীন মাংসভোজীদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এর পশ্চাৎ আমার হেতু হল এই যে, শ্রীরাম অথবা সেই সময়ের ক্ষত্রিয় ও অন্য মনুষ্যদের ধর্মাত্মা, বেদব্রতী ও অহিংসক বলা হয়েছে, তারা বেদবিরুদ্ধ অন্যায় কর্ম কিভাবে করতে পারবেন? যেখানে একদিকে শ্রীরাম জীকে **"রক্ষিতা জীবলোকস্য"** বলা হয়েছে (বাল্মীকি রামায়ণ), তিনি জীবদের হত্যা কিভাবে করতে পারেন? যে শ্রীরাম জী বালীকে বধের সময় উচিত সিদ্ধ করার হেতু ভগবান্ মনুর আদেশের প্রমাণ দিয়েছেন তথা স্বয়ংকে তারই বলা নিয়ম মর্যাদায় বাঁধা বলেছেন, সেই শ্রীরাম জী ভগবান্ মনুর শিকার খেলাকে সর্বোপরি ও সর্বপ্রথম দূর্ব্যসন আর প্রচণ্ড পাপ বলার পরেও কিভাবে শিকার করতে পারেন? যদি করেন তো **"রামোদ্বির্নভাষতে"** এর কি হবে? অর্থাৎ শ্রীরাম জীর বিষয়ে প্রসিদ্ধ ছিল যে তিনি যেটা বলতেন, সেটাই করতেন। বার-বার বিচার বদলাতেন না। এরকম মহান্ ভগবান্ রামের উপর দোষ উঠানো স্বয়ং এক ভারী পাপ হবে। এই কারণে স্পষ্টতঃ হিংসার প্রসঙ্গগুলো হল প্রক্ষিপ্ত তথা ধূর্তদের শয়তানী।
আজ কিছু মহানুভব মাংসাহারকে ক্ষত্রিয়ের জন্য বিদিত বলে থাকে, বস্তুতঃ তারা বৈদিক সনাতন ক্ষাত্রধর্মকে অংশ মাত্রও বোঝে না। যে ভগবান্ মনু জীর চর্চা আমি করেছি, তিনি বিশ্বের প্রথম রাজা ছিলেন তথা ভগবান্ শ্রী রাম জী প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন। যখন এনারা দু'জনই মাংসাহারকে অধর্ম মানতেন, তাহলে মাংসাহার ক্ষত্রিয়দের জন্য উচিত কে বললো? ভগবান্ মনু তো শিকার খেলাকে সর্বপ্রথম দোষ মেনেছেন, তখন কোন মূর্খ ক্ষত্রিয়ের শিকার খেলাকে উচিত বলতে পারে? ক্ষত্রিয় রাজাকে ব্রাহ্মণত্ব যুক্ত হওয়া অর্থাৎ বেদের পূর্ণ বিদ্বান ও য়োগী হওয়া উচিত, একথাও মনু ভগবান্ বলেছেন। যজুর্বেদ ভাষ্যে মহর্ষি দয়ানন্দ জী মহারাজ রাজা ও ন্যায়াধীশকে য়োগী হওয়া অনিবার্য বলেছেন তথা দ্বাপরযুগে বিশ্ব প্রসিদ্ধ যোদ্ধা পিতামহ ভীষ্ম জী অহিংসাকে পরম ধর্ম বলেছেন, তাহলে কোন ক্ষাত্রধর্মবিত্ মাংসাহারের ওকালতি করতে পারে? তবে হ্যাঁ, রাক্ষস আদি বর্বর লোকে অবশ্যই নিজের ক্রুর স্বভাববশ মাংসাহার করতো আর এই ক্রুরদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের সদা যুদ্ধই হয়ে থাকে।

যদি কেউ নিজেকে রাক্ষস বলতে চায় আর মাংসাহারের ওকালতি করে, তবে তাকেও রাক্ষসরাজ মহাত্মা বিভীষণ হতে প্রেরণা নেওয়ার পরামর্শ দিবো, দুরাত্মা রাবণ হওয়ার পক্ষ দিবো না। হ্যাঁ, দুর্ভাগ্য যে মধ্যকালীন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই দোষ অবশ্য এসেছিল আর তাদের ক্ষাত্রধর্মের জন্য প্রমাণ মানা যায় না। এই দোষগুলো, তথা মদিরা, বেশ্যাগমন আদি পাপগুলো ভারতের সেই রাজাদের নাশও করে দিয়েছে।

• বৈদিক ধর্ম এবং মাংসাহার •

আপনি লিখেছেন -

"মাংসাহার হিন্দু ধর্মের প্রতিকূল নয়।" এর জন্য আপনি মনুস্মৃতির কিছু শ্লোকের হিন্দি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন, যারমধ্যে শ্রাদ্ধ, পশুবলি ও সামান্য মাংসাহারকে উচিত বলা হয়েছে।

সমীক্ষা - আমি এটা মানছি যে মনুস্মৃতিতে আপনার দ্বারা উদ্ধৃত সকল শ্লোক উপর্যুক্ত অর্থেই বিদ্যমান আছে, তবে আমাদের দৃঢ় মত হল যে, ধর্ম বিরোধী পাপীরা এই প্রক্ষেপ করেছে। মনুস্মৃতিতে সর্বমোট ২৬৮৫টি শ্লোকের মধ্যে ১৪৭১টি প্রক্ষিপ্ত তথা ১২১৪টি মূল রয়েছে। একে পূর্ণ স্পষ্ট বুঝার হেতু আর্ষ সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট, ৪২৭, মন্দিরের গলীখারী বাবলী, দিল্লি-৬ দ্বারা প্রকাশিত তথা ডা০ সুরেন্দ্রকুমার জী দ্বারা করা মনুস্মৃতি ভাষ্যকে নিষ্পক্ষতা ও পূর্বাগ্রহ মুক্ত হয়ে পড়ার কষ্ট করবেন। আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, এক নতুন প্রকাশ পাবেন তথা ভগবান্ মনুর ধর্ম বিশুদ্ধ রূপে উজ্জ্বল লাগবে। দেখুন! মনু জী বলেছেন -

"বর্জয়েন্মধুমাম্সম্ চ" (মনু ৬|১৪)

অর্থাৎ - সব মদকারী মদ্য, ভাঙ্গ আদি পদার্থ তথা মাংস হল নিষেধ।

না কৃত্বা প্রাণিনাম্ হিম্সা মাম্সমুত্পদ্যতে ক্বচিত্।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাম্সম্ বিবর্জয়েত্॥

(মনু ৫|৪৮)

য়ো বন্ধন বধক্লেশান্ প্রাণিনাম্ ন চিকীর্ষতি।
স সর্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্ত মশ্নুতে॥

(মনু ৫|৪৬)

সমুত্পত্তি চ মাম্সস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্তেত সর্বমাম্সস্য ভক্ষণাত্॥

(মনু ৫|৪৯)

অর্থাৎ - যে ব্যক্তি প্রাণীদের বন্ধনে রাখতে, হত্যা করতে, তাদের কোনো রূপ কষ্ট দিতে চায় না, সে সকল প্রাণীর হিতৈষী অত্যন্ত সুখকে প্রাপ্ত করে। প্রাণীদের হিংসা না করে মাংস কখনও প্রাপ্ত হয় না আর জীবের হত্যা করা সুখদায়ক নয়। এই কারণে মাংস খাওয়া উচিত নয়। মাংসের উৎপত্তি যেভাবে হয়, তাতে প্রাণীর হত্যা আর বন্ধনের কষ্টকে দেখে সব প্রকারের মাংস ভক্ষণ থেকে দূরে থাকবে। এরপর মাংস খাওয়াতে আট পাপীর কথা বলা হয়েছে, যাকে আমি পূর্বেই লিখেছি। এতেই নয়, এই অধ্যায়ে ১২৩ তম শ্লোকে রক্ত দ্বারা অপবিত্র পাত্রকে কোনো প্রকারেই শুদ্ধ না হওয়ার যোগ্য লেখা রয়েছে, এরকম মনুকে মাংসহারের

সমর্থক কে বলতে পারবে? আপনি বা এমন মিথ্যা আক্ষেপকারী শান্তি ও নিষ্পক্ষতা দ্বারা বিচার করুন, তবে পাবেন যে এটা ধূর্তদের লীলা।

আপনার কথন হল -

"ঋগ্বেদে বলা হয়েছে - যখন আমি দেবতার প্রতি শত্রুদের উপর নিজের সাথীদের সঙ্গে আক্রমণ করবো। তোমার জন্য পুষ্ট গাভী রন্ধন করবো আর সোমরস পিষবো (ঋগ্বেদ ১০/২৯/২)। ঋগ্বেদ ১০/২৮/৩ এরমধ্যেও সোমরস পান আর রন্ধন করা মাংসকে খেয়ে ফেলার বর্ণন আছে। অথর্ববেদ ৭/৬৩৭ তে আছে - এটা যে গাভীর দুগ্ধ আর মাংস আছে, সেটা বেশি স্বাদেষ্ট হয়ে থাকে। তাকে (অতিথির পূর্বে) খাবে না। যারা মাংসের উপসেবন করে অতিথিদের প্রস্তুত করে, তারা যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত করে (অথর্ববেদ ৭/৬/৪০-৪২)।

সমীক্ষা - আপনি প্রথম মন্ত্রের স্থানটা সঠিক দেননি। সম্ভবতঃ (ঋগ্বেদ ১০|২৮|২) দ্বারা নিজের বিচারের পুষ্টি করতে চাচ্ছেন। মন্ত্র না দিয়ে কেবল ভাবার্থ লিখে দেওয়াটা উচিত নয়, এছাড়া কয়েক বেদ ভাষ্যকারদের ভাষ্য সর্বসুলভ রয়েছে। মন্ত্রের দেবতা হল ইন্দ্র, যার এখানে অর্থ হবে রাজা অথবা আত্মা। মন্ত্রার্থ জানবার পূর্বে তার প্রতিপাদ্য বিষয় দেবতার জ্ঞান অনিবার্য রয়েছে। এখানে "**বৃষভ**" শব্দকে দেখে লোকেদের ষাঁড়ের ভ্রম হয়েগেছে। বস্তুতঃ এখানে "**বৃষভ**" অর্থ সুখের বর্ষণকারী, আত্মা ও রাজা হবে। এই বৃষভকে পৃথ্বীর অতি শ্রেষ্ঠ ও সুখপূর্বক আসনে বিরাজমান বলা হয়েছে, তাহলে এটা ষাঁড় তো হতেই পারে না। তারপর এই বৃষভের সঙ্গে সোমরস পেষি, এই বাক্য নেই বরং বৃষভের পশ্চাৎ **"য়ঃ সুতসোমঃ পৃণাতি"** রয়েছে। এখানে **"য়ঃ সুতসোমঃ"** এই শব্দ বৃষভের জন্য প্রযুক্ত অর্থাৎ যে বৃষভ সোমরস তৈরি করেছে, সে আমায় পূর্ণতা প্রদান করে। তাহলে "**বৃষভ**" এর অর্থ গাভী হতে পারে না কারণ গাভী তো সোমরস পিষতে পারে না। এই প্রকারে বৃষভ কোনো অন্য মনুষ্য অথবা আত্মা হবে। এখানে যখন সোমের অর্থ উপাসনা হবে, তখন "**বৃষভ**" এর অর্থ আত্মা হবে। আবার যখন "বৃষভ" এর অর্থ রাজা হবে, তখন সোমের অর্থ বদলে যাবে। পরের মন্ত্রে "**বৃষভ**" এর অর্থ সুখ বর্ষণকারী পদার্থ তথা কাকড়াসিঙ্গী নামক ঔষধি বিশেষের নাম হবে। এর পুষ্টি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ভাবপ্রকাশ তথা রাজ নিঘণ্ডু দ্বারা হয়েছে, যেখানে গাভী অর্থকারক অনেক নাম, এই ঔষধি বিশেষের জন্য এসেছে, তাহলে কে কিভাবে কাকড়াসিঙ্গীকে গাভী বলতে পারে?

সঃ রোরুবত্ বৃষভঃ তিগ্মশৃঙ্গঃ বর্ষ্মন্ তস্থৌ বরিমন্ আ
পৃথিব্যাঃ। বিশ্বেষু এনম্ বৃজনেষু পামি য়ঃ মে কুক্ষী
সুতসোমঃ পৃণাতি।। (ঋগ্বেদ ১০|২৮|২)

এর ঋষি হল বসুক্রঃ। [ব্রহ্ম বৈ বসুক্রঃ (ঐ০অ০১|১|২)]

এর তাৎপর্য হল এই যে, এর উৎপত্তি ব্রহ্মরূপ প্রাণ রশ্মি দ্বারা হয়ে থাকে।

দেবতা - ইন্দ্রঃ, ছন্দ - নিচৃত্ ত্রিষ্টুপ্

সেটা তীক্ষ্ণ ধ্বনি দ্বারা যুক্ত নানা রশ্মির বর্ষণকারী
[শৃঙ্গম্= শৃঙ্গাণি জ্বলতোনাম (নিঘন্টু ১|১৭)। তিগ্মম্= বজ্রনাম (নিঘন্টু ২|২০)] তীক্ষ্ণ জ্বালা দ্বারা যুক্ত, মহান্ বল দ্বারা যুক্ত সূর্য অন্তরীক্ষে শ্রেষ্ঠতাপূর্বক স্থিত রয়েছে। প্রাণতত্ব সকল প্রকার বলের দ্বারা এই সূর্যের পালন ও রক্ষণ করছে। সেই সূর্য প্রাণ রশ্মি দ্বারাই নিজের কুক্ষি অর্থাৎ উদরে সম্পীডিত সোম তত্বকে পরিপূর্ণতায় প্রাপ্ত করে। সূর্যের ভিতর বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিভাষিত গুরুত্ব বল, নাভিকীয় প্রবল বল, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল আদির অতিরিক্ত অনেক বৈদিক বিজ্ঞানে বর্ণিত অন্য বলেরও ভূমিকা হয়ে থাকে। সকল বলের পিছনে বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিদেরই মুখ্য ভূমিকা হয়ে থাকে। সূর্যের কেন্দ্রীয় ভাগে বিভিন্ন নাভিকের সংলয়ন, এরকম নাভিকের সেই কেন্দ্রীয় ভাগ পর্যন্ত গমন আদি কর্মেও বিভিন্ন প্রাণাদি রশ্মির ভূমিকা হয়ে থাকে। এরজন্য আমার গ্রন্থ "**বেদবিজ্ঞান-আলোক**" পঠন করবেন।

এটা হল কেবল আধিদৈবিক (বৈজ্ঞানিক) অর্থ, তাও আবার সংক্ষেপে। এর এখন আধ্যাত্মিক আর আধিভৌতিক (লৌকিক ব্যবহারিক) অর্থ আরও হতে পারে, আমি বিস্তারভয়ের জন্য এই দুই প্রকারের অর্থকে এখানে ছেড়ে দিচ্ছি। বস্তুতঃ বেদার্থ করা প্রত্যেক বিদ্বানের কার্য নয়, তা সে সংস্কৃত ব্যাকরণের গম্ভীর বিদ্বান হওয়ার পরেও। আর প্রতিত হচ্ছে আপনি তো সংস্কৃত ভাষা হতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ । এখান-ওখান থেকে নকল করে বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উপর আক্ষেপ করছেন। আপনি যাদের অনুবাদ বা ভাষ্যকে উদ্ধৃত করেছেন, তারাও বেদার্থের বর্ণমালা জানে না, তাহলে আপনাকে বলবোই বা কি? এরজন্য আপনাকে আমার মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ "বেদবিজ্ঞান-আলোক" পড়ার চেষ্টা করা উচিত কিন্তু তাকে বুঝতে আপনাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে-সঙ্গে সৈদ্ধান্তিক ভৌতিক বিজ্ঞানে ন্যূনতম M.Sc -র যোগ্যতা অর্জিত করার আবশ্যকতা রয়েছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রেরও দেবতা হল ইন্দ্র, যার অর্থও রাজা ও আত্মা হবে। এরও বৈজ্ঞানিক অর্থ আমার শৈলী দ্বারা করা যেতে পারে। অথর্ববেদের রেফারেন্সের বিষয়ে প্রথম নিবেদন তো এটা যে, নকল করে লেখা লিখন উপহাসেরই পাত্র হয়। আপনি অথর্ববেদ চোখেই দেখেননি অন্যথা উপর্যুক্ত স্থানে এই প্রকারের অর্থের প্রতীতিকারক মন্ত্রই নেই। প্রথম মন্ত্রের স্থান (৭|৬|৩৭) হবে, যাকে আপনি (৭|৬৩৭) করে দিয়েছেন। একে যদি মুদ্রণ দোষও মানা হয়, কিন্তু অথর্ববেদ কাণ্ড ৭, সূক্ত ৬ তে মোট ৪ টাই মন্ত্র রয়েছে, তাহলে আপনার দ্বারা উদ্ধৃত ৩৭, ৪০-৪২ মন্ত্র কোথা থেকে এসে গেল? আপনার এই প্রকারের লিখন আপত্তিজনক ও মিথ্যা। প্রথমে কোনো গ্রন্থকে দেখা উচিত, তদুপরান্তই তার উপর লেখা চালানো উচিৎ। কোনোখান থেকে নকল করে লেখা চুরি করা হয় আর চুরি করা লিখন যদি মিথ্যা হয়, তাহলে কি বলবো? এমন দশা হয়েছে আপনার। বিশ্বে কেউই এই মন্ত্রকে দেখাতে পারবে না। আমার মনে হয় যে, আমার এই আক্ষেপকে পড়ে আপনি আরও নতুন কোনো চুরির চেষ্টা করবেন অথবা কোনোখান থেকে অথর্ববেদ নিয়ে এসে খোঁজার

চেষ্টা করবেন। আমি আপনার পরিশ্রম বাঁচাচ্ছি আর এখানে বলে দিচ্ছি যে আপনার এরকম মিথ্যা অর্থের প্রতীতি কোথায় হতে পারে? এই প্রকারের ভ্রান্তি আপনাকে নিম্ন স্থলে হতে পারে -

এতদ বা উ স্বাদীয়ো য়দাধিগবম্ ক্ষীরম্ বা মান্সম্বা
তদেব নাশ্নীয়াত্। (অথর্ববেদ ৯|৫|৯)

এই মন্ত্রের অর্থ শ্রী ক্ষেমকরণদাস জী ত্রিবেদী "**অধিগবম্**" এর অর্থ অধিকৃত জল তথা "**মান্স**" এর অর্থ মননসাধক বুদ্ধিবর্ধক বস্তু করেছে। যদি আপনি বলেন যে এটা মন্ত্রের টানাহেঁচড়া হচ্ছে, তবে সোজা অর্থ গোমাংসই হয়। মহাশয়! যদি বৈদিক শব্দের সোজা অর্থ করতে থাকেন, তবে অনেক অসুবিধা হবে, যা থেকে বেরিয়ে আসা আপনার পক্ষে সম্ভব না। বেদে তো চার শিং, তিন পা, দুই মস্তক, সাত হাতওয়ালা বৃষভেরও বর্ণন রয়েছে। পারবেন এখানে বৃষভের সোজা অর্থ গাভী করতে? আমার মনে হয় যে আপনি এমনটা করে হাস্যাস্পদ স্থিতিতে ফেঁসে যেতে চাইবেন না। এইজন্য আমি নিবেদন করবো যে, সাবধান হয়ে অর্থের উপর বিচার করা উচিত। নকল করতেও বুদ্ধির আবশ্যকতা পরে। "**গো**" শব্দের কত অর্থ হয়, এটা বেদে না হলেও, মানুষের মধ্যেই দেখে নিন। আপ্তে শব্দকোষেও জল অর্থ দেওয়া হয়েছে, তাহলে শ্রী ত্রিবেদীর অর্থ বৈদিক কেন লৌকিক দৃষ্টি দ্বারাও অনুকূল হবে।

এখন আমি এর উপর আমার ভাষ্য প্রস্তুত করছি, যাকে বোঝার সামর্থ্যও ফারুক খান জী! আপনার মধ্যে হবে না আর কোনো মাংসাহারীও একে পুর্ণতঃ বুঝে যাবে, সেটাও সন্দিগ্ধ। দেখুন আমার ভাষ্য -

এর উপর আমার (**আচার্য্য অগ্নিব্রত জী**র) মত -

এটির ভাষ্যতে আর্য বিদ্বান প্রো০ বিশ্বনাথ বিদ্যালঙ্কার এখানে "**মান্স**" এর অর্থ পনীর করেছে, তবে পণ্ডিত ক্ষেমকরণদাস ত্রিবেদী মননসাধক (বুদ্ধিবর্ধক) পদার্থকে মাংস বলেছে। সকলে এই মন্ত্র তথা সূক্তের অন্য মন্ত্রের বিষয় অতিথি সৎকার বলেছে। এই মন্ত্রের দেবতা পণ্ডিত ক্ষেমকরণদাস ত্রিবেদীর দৃষ্টিতে অতিথি ও অতিথিপতি, অন্যদিকে পণ্ডিত সাতবলেকর অতিথি বিদ্যা মেনেছে। পণ্ডিত সাতবলেকর এটির ঋষি ব্রহ্মা মেনেছে। ছন্দ পিপীলিকা হল মধ্যা গায়ত্রী।

{ব্রহ্মা=মনো বৈ য়জ্ঞস্য ব্রহ্মা (শ০ ১৪|৬|১|৭); প্রজাপতির্বৈ ব্রহ্মা (গো০ উ০ ৫|৮)। অতিথিঃ=য়ো বৈ ভবতি য়ঃ শ্রেষ্ঠতামশ্নুতে স বা অতিথির্ভবতি (ঐ০ আ০ ১|১|১)। অতিথিপতিঃ= অতিথিপতির্বাবাতিথেরীশে (ক০ ৪৬|৪-ব্রা০ উ০ কো০ থেকে উদ্ধৃত)। পিপীলিকা=পিপীলিকা পেলতের্গতিকর্মণঃ (দৈ০ ৩|৯)। স্বাদু=প্রজা স্বাদু (ঐ০আ০ ১|৩|৪); প্রজা বৈ স্বাদুঃ (জৈ০ ব্রা০ ২|১৪৪); মিথুনম্ বৈ স্বাদু (ঐ০ আ০ ১|৩|৪)। ক্ষীরম্=য়দত্যক্ষরত্ তত্ ক্ষীরস্য ক্ষীরত্বম্ (জৈ০ ব্রা০ ২|২২৮)। মান্সম্=মান্সম্ বৈ পুরীষম্ (শ০ ৮|৬|২১৪); মান্সম্ বা মানসম্ বা মনোঽস্মিন্ সীদতীতি বা (নি০ ৪|৩); মান্সম্ সাদনম্ (শ০ ৮|১|৪|৫)}।

আমার (আচার্য্য অগ্নিব্রত জীর) আধিদৈবিক ভাষ্য -

পদার্থঃ (এতত্ বা স্বাদীয়ঃ) যে অতিথি অর্থাৎ সতত গমনশীলা প্রাণ, ব্যান রশ্মির এবং অতিথিপতি অর্থাৎ প্রাণাপান রশ্মির নিয়ন্ত্রক সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির স্বাদুযুক্ত হয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ছন্দাদি রশ্মিকে মিথুন বানিয়ে নানা পদার্থের উৎপন্ন করাতে সহায়ক হয়। (য়ত্) যে প্রাণব্যান ও সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির (অধিগবম্ ক্ষীরম্ বা মান্সম্ বা) গো অর্থাৎ 'ওম্' ছন্দ রশ্মি রূপী সূক্ষ্মতম বাক্ তত্বে আশ্রিত হয়, সাথেই নিজের পুরীষ=পূর্ণ সংযোজন বল {পুরীষম্=পূর্ণম্ বলম্ (ম০ দ০ য়০ ভা০ ১২|৪৬); ঐন্দ্রম্ হি পুরীষম্ (শ০ ৮|৭|৩|৭); অন্নম্ পুরীষম্ (শ০ ৮|১|৪|৫)} এর সাথে নিরন্তর নানা রশ্মি বা পরমাণু আদি পদার্থের উপর ঝড়তে থাকে। এই 'ওম্' রশ্মির ঝড়নাই ক্ষীরত্ব তথা পূর্ণ সংযোতাকেই মান্সত্ব বলা হয়। এখানে 'মান্স' শব্দ এই সংকেত দেয়, যে এই 'ওম্' রশ্মির মনস্তত্ব হতে সর্বাধিক রূপ হতে নিকটতা হতে সম্বন্ধ হয়ে থাকে কিংবা মনস্তত্ব এরমধ্যে সর্বাধিক মাত্রাতে বসে থাকে। এই 'ওম্' রশ্মির প্রাণব্যান এবং সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির উপর ঝড়ে অন্য স্থুল পদার্থের উপর পড়তে থাকে। (তত্ এব ন অশ্নুয়াত্) এই কারণে বিভিন্ন রশ্মি বা পরমাণু আদি পদার্থের মিথুন তৈরির প্রক্রিয়া নষ্ট হয় না। এই প্রক্রিয়া অতিথিরূপ প্রাণব্যানকে মিথুন বানানো কিংবা এর দ্বারা বিভিন্ন মরুদাদি রশ্মিদের আকৃষ্ট করার প্রক্রিয়া শান্ত হওয়ার পূর্বে নষ্ট হয় না, বরং তার পশ্চাৎ অর্থাৎ দুই কণের সংযুক্ত হওয়ার পশ্চাৎ আর মিথুন তৈরির প্রক্রিয়া নষ্ট বা বন্ধ হয়ে যায়, এটা জানা উচিত।

এই ঋচার সৃষ্টির উপর প্রভাব -

আর্ষ ও দৈবত প্রভাব- এটির ঋষি ব্রহ্মা হওয়াতে সংকেত পাওয়া যায় যে এটির উৎপত্তি মন এবং 'ওম্' রশ্মির মিথুন দ্বারাই হয়ে থাকে। এই মিথুন এই ছন্দ রশ্মিকে নিরন্তর ও নিকটতা থেকে প্রেরিত করতে থাকে। এর দৈবত প্রভাব দ্বারা প্রাণ, ব্যান তথা সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিগুলো বিশেষ সক্রিয় হয়ে নানা সংযোগ কর্মের সমৃদ্ধ করে।

• ছান্দস প্রভাব - এটির ছন্দ পিপীলিকা মধ্যা গায়ত্রী হওয়ায় এই ছন্দ রশ্মি বিভিন্ন পদার্থের সংযোগের সময় তাদের মধ্যে তীব্র তেজ ও বলের সাথে সতত সঞ্চারিত হয়। এটির থেকে ঐ পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ তেজ এবং বলের প্রাপ্ত হতে থাকে।

• ঋচার প্রভাব - যখন দুই কণার সংযোগ হয়, তখন তারমধ্যে প্রাণ, ব্যান ও সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির বিশেষ যোগদান হতে থাকে। এই রশ্মির বিভিন্ন মরুদ্ রশ্মির দ্বারা আকুঞ্চিত আকাশ তত্বকে ব্যাপ্ত করে নেয়। এই সময় এই রশ্মির উপর সূক্ষ্ম 'ওম্' রশ্মিগুলো নিজের সেচন করে এতে অধিক বল দ্বারা যুক্ত করে। এর ফলে উভয় কণার মধ্যে ফীল্ড নিরন্তর প্রভাবী হয়ে ঐ দুই কণাকে পরস্পর সংযুক্ত করে দেয়।

আমার (আচার্য্য অগ্নিব্রতজীর)আধিভৌতিক ভাষ্য -

পদার্থঃ (এতত্ বা স্বাদীয়ঃ) এই যে স্বাদিষ্ট ভোজ্য পদার্থ আছে। (য়দধিগবম্ ক্ষীরম্ বা) যা গাভী হতে প্রাপ্তকারী দুধ, ঘৃত, মাখন, দই আদি পদার্থ আছে অথবা (মান্সম্ বা) মনন, চিন্তন আদি কার্যে উপযোগী

ফল, বাদাম আদি পদার্থ। *(তদেব ন অশ্নীয়াত্) সেই পদার্থকে অতিথিকে খাওয়ানোর পূর্বে খাবে না অর্থাৎ অতিথিকে খাওয়ানোর পশ্চাৎই খাওয়া উচিত। এখানে অতিথি থেকে পূর্বে না খাওয়ার প্রসঙ্গ এটির পূর্ব মন্ত্র থেকে সিদ্ধ হচ্ছে, যেখানে লেখা আছে - ‘‘অশিতাবত্যতিথাবশ্নীয়াত্’’= অশিতাবতি অতিথৌ অশ্নীয়াত্। এই প্রকরণকে পূর্ব আধিদৈবিক ভাষ্যেতেও বুঝে নেবেন।

* **‘মাম্সম্’** পদের বিবেচনাঃ- এই বিষয়ে সর্বপ্রথম আর্য বিদ্বান পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মা কৃত ‘‘বৈদিক সম্পত্তি’’ নামক গ্রন্থতে আয়ুর্বেদের কিছু গ্রন্থকে উদ্ধৃত করে বলেন -

"সুশ্রুতে" আমের ফলের বর্ণন করে লিখেছেন -

অপক্কে চূতফলে স্নায়্বস্থিমজ্জানঃ সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে পক্কে ত্বাঽবির্ভূতা উপলভ্যন্তে।

অর্থাৎ - আমের কাচা ফলের স্নায়ু, হাড্ডি আর মজ্জা আদি প্রতীত হয় না, কিন্তু পাকার পরে সব আবির্ভূত হয়ে যায়।

এখানে আটির তন্তুকে কেশ, আটিকে হাড্ডি, আশকে স্নায়ু আর কোমল ভাগকে মজ্জা বলা হয়েছে। এই প্রকারে বর্ণন ভাবপ্রকাশেও এসেছে। সেখানে লেখা আছে যে -

আম্রাস্যানুফলে ভবন্তি য়ুগপন্মাম্সাস্থিমজ্জাদয়ো লক্ষ্যন্তে
ন পৃথক্ পৃথক্ তনুতয়া পুষ্টাস্ত এব স্ফুটাঃ।
এবম্ গর্ভসমুদ্ভবে ত্ববয়বাঃ সর্বে ভবন্ত্যেকদা লক্ষ্যাঃ
সূক্ষ্মতয়া ন তে প্রকটতামায়ান্তি বৃদ্ধিঙ্গতাঃ।

অর্থাৎ - যে প্রকার কাঁচা আমের ফলে মাংস, অস্থি আর মজ্জাদি পৃথক-পৃথক দেখা যায় না, কিন্তু পাকার পরেই জ্ঞাত হয় সেই প্রকার গর্ভের আরম্ভে মনুষ্যের অঙ্গও জ্ঞাত হয় না, কিন্তু যখন তার বৃদ্ধি হয়, তখন স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই দুই প্রমাণের দ্বারা প্রকট হচ্ছে যে ফলের মধ্যেও মাংস, অস্থি, নাড়ী আর মজ্জা আদি সেই প্রকার বলা হয়েছে, যে প্রকার প্রাণীদের শরীরে বলা হয়।

বৈদ্যকের এক গ্রন্থে লেখা আছে যে -

প্রস্থম্ কুমারিকামাম্সম্।

অর্থাৎ- এক কিলো কুমারিকার মাংস। এখানে ঘীকুমারকে কুমারিকা আর তার গুদেকে মাংস বলা হয়েছে। বলার তাৎপর্য এই যে, যেভাবে ঔষধির আর পশুদের নাম একই শব্দে রাখা হয়েছে সেইভাবে ঔষধির আর পশুদের শরীরাবয়বও একই শব্দে বলা হয়েছে। এই প্রকারের বর্ণনা আয়ুর্বেদের গ্রন্থে ভরে পরে রয়েছে। শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, মুম্বাইতে ছাপানো ‘ঔষধিকোষ’ এ নীচে লেখা সমস্ত পশুসংজ্ঞক নাম আর অবয়ব বনস্পতিগুলো জন্যও এসেছে দেখে নিন। আমি উদাহরণের জন্য কিছু শব্দ উদ্ধৃত করেছি -

বৃষভ - ঋষভকন্দ

সিংহী - কটেলী, বাসা
হস্তি - হস্তিকন্দ
শ্বান - কুত্তাঘাস, গ্রন্থিপর্ণ
খর - খরপর্ণিনী
বপা - ঝিল্লী=বক্কলের ভিতরের জালা
মার্জার - বল্লীঘাস, চিত্তা
কাক - কাকমাচী
অস্থি - গুঠলী
ময়ুর - ময়ুরশিখা
বারাহ - বারাহীকন্দ
মাংস - গুদা, জটান্মাসী
বীছূ - বীছূবূটী
মহিষ - মহিষাক্ষ, গুগুল
চর্ম - বক্কল
সর্প - মর্পিণীবূটী
শ্যেন - শ্যেনঘন্টী (দন্তী)
স্নায়ু - রেশা
অশ্ব - অশ্বগন্ধা, অজমোদা
মেষ - জীবশাক
নখ - নখবূটী
নকুল - নাকুলীবূটী
কুক্কুট (টী) - শাল্মলীবৃক্ষ
মেদ - মেদা
হংস - হংসপদী
নর - সৌগন্ধিক তৃণ
লোম (শা) - জটামাসী
মৎস্য - মত্স্যাক্ষী
হৃদ - দারচীনী
মূষক - মূষাকর্ণী
মৃগ - সহদেবী, ইন্দ্রায়ণ, জটামসী, কপুর
পেশী - জটামসী

গো - গৌলোমী
পশু - অম্বাড়া, মোথা
রুধির - কেসর
মহাজ - বড়ী অজবায়ন
কুমারী - ঘীকুমার
আলম্ভন - স্পর্শ

এই সূচীতে সমস্ত পশু পক্ষীর আর তাদের অঙ্গের নাম তথা সমস্ত বনস্পতির আর তাদের অঙ্গের নাম একই শব্দ দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় কিছু শব্দ দ্বারা পশু আর তারই অঙ্গকে গ্রহণ করা উচিত নয়। বিজ্ঞ পাঠক এখানে বিচার করুন ঐরূপ স্থিতিতে যেখানে 'মাম্সম্' পদ হতে গৌ আদি পশুর বা পক্ষীর মাংস গ্রহণ করা কি মুর্খতা নয়? এখানে কোনো পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা অভিভূত তথা বৈদিক বা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপহাসকর্তা কথিত প্রবুদ্ধ কিংবা মাংসাহারের পোষক সংস্কৃত ভাষার এইরূপ নামের উপর ব্যঙ্গ্য যেন না করে, এই কারণে আমি তাদের ইংরেজি ভাষারও কিছু উদাহরণ দিচ্ছি -

১. Lady Finger ভেণ্ডীকে বলা হয়। যদি ভোজন বিষয়ে কেউ এর অর্থ কোনো মহিলার আঙ্গুল করে, তখন কি তার অপরাধ হবে না?

২. Vegetable কোনো শাক বা বনস্পতিকে বলা হয়। অন্যদিকে Chamber dictionary তে এর অর্থ Dull understanding person -ও দেওয়া রয়েছে। যদি Vegetable খেতে বসা কোনো ব্যক্তিকে দেখে কেউ তাকে মন্দবুদ্ধি মানুষের খাদ্য পদার্থ বলে, তখন কি এটা মূর্খতা হবে না?

৩. আয়ুর্বেদে একটি চারাগাছ আছে - গোবিষ, যাকে হিন্দীতে কাকমারী তথা ইংরেজিতে Fish Berry বলা হয়। যদি কেউ এর অর্থ মাছের রস লাগায়, তখন তাকে কি বলবেন?

৪. Potato আলুকে বলা হয়, অন্যদিকে এর অর্থ A mentally handicapped person -ও হয়, তখন কি আলু খাওয়া ব্যক্তিকে মানসিক রোগী মনুষ্য ভক্ষণকারী মানা হবে?

৫. Hag এটা এক প্রকারের ফল, অন্যদিকে An ugly old woman -কেও hag বলা হয়, তখন কি এখানেও কেউ hag ফলের অর্থ উল্টোই লাগানোর চেষ্টা করবে?

এখন আমরা এর উপর বিচার করি যে ফলের গূদাকে মাংস কেন বলে? যেমনটা আপনি আধিদৈবিক ভাষ্যে জেনেছেন যে, পূর্ণবলযুক্ত বা পূর্ণবলপ্রদ পদার্থকে মাংস বলা হয়। বিশ্বে সকল মনুষ্য ফলের গূদারই প্রয়োগ করে থাকে, অন্য ভাগকে নয়, কেননা ফলের সার ভাগ হল সেটাই। সেই ভাগ হল বল-বীর্যের ভাণ্ডার অর্থাৎ তার ভক্ষণ দ্বারা বল-বীর্য-বুদ্ধি আদির বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করতে পারে যে, প্রাণিদের শরীরের মাংসকে মাংস কেন বলা হয়েছে? এর উত্তর হল এই যে, যেকোনো প্রাণীরই শরীরের বল তার মাংসপেশীর অন্তর্গতই নিহিত থাকে, এই কারণে একেও মাংস বলা হয়। যেরূপ শাকাহারী প্রাণী ফলের

গূদাকেই বিশেষ ভক্ষণ করে, সেইরকম সিংহাদি মাংসাহারী প্রাণী, প্রাণীর মাংস ভাগকেই বিশেষ রূপে খেয়ে থাকে। এই উভয়ের মধ্যে সমানতা রয়েছে। যে স্থানটি ফলের মধ্যে গূদার হবে, সেই স্থানটি প্রাণীর শরীরের মধ্যে মাংস হবে। মনুষ্য হল প্রাকৃতিক রূপে কেবল শাকাহারী ও দুগ্ধাহারী প্রাণী, এই কারণে বেদাদি শাস্ত্রে প্রাণীর মাংস খাওয়ার চর্চা হল বেদাদি শাস্ত্রের ঐতিহ্য হতে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার লক্ষণ। এরূপ চর্চাকারী কথিত বেদজ্ঞ, তা সে বিদেশী হোক বা স্বদেশী, আমাদের দৃষ্টিতে তারা বেদাদি শাস্ত্রের বর্ণমালাও জানে না, তা তিনি ব্যাকারণাদি শাস্ত্রের যত বড়ই অধ্যেতা- অধ্যাপক হোন না কেন।

• **প্রশ্ন -** বেদে '**মাম্সম্**' পদের অর্থ প্রাণীদের মাংস কখনও হয় না, এটা আপনার পূর্বাগ্রহও তো ধরে নেওয়া যেতে পারে, যা শুধুমাত্র শাকাহারের আগ্রহবশেই করা হয়েছে?

• **উত্তর** - যে সংস্কারে সামান্য যোগসাধকের জন্য অহিংসাকে প্রথম সোপান বলা হয়েছে, যেখানে মন, বচন, কর্ম দ্বারা কোথাও এবং কখনও কোনো প্রাণীর প্রতি ঘৃণা ত্যাগ অর্থাৎ প্রীতির সন্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সিদ্ধ পুরুষ যোগীদের এবং সেই ক্রমে নিজের যোগসাধনা দ্বারা ঈশ্বর ও মন্ত্রের সাক্ষাৎকৃতধর্মা মহর্ষির, তাদের গ্রন্থের এবং বেদরূপ ঈশ্বরীয় গ্রন্থের দ্বারা হিংসার সন্দেশ দেওয়া মূর্খতা ও দুষ্টতা নয় তো কি? যে বিদ্বান বৈদিক অহিংসার স্বরূপ দেখতে চান, তিনি পতঞ্জল যোগদর্শন ব্যাসভাষ্য স্বয়ং পড়ে দেখুক। এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যেখানে প্রায়ঃ সকল ভাষ্যকারই পশুর নৃশংস বধ এবং তার অঙ্গকে ভক্ষণের বিধান করেছে, সেখানে আমি তার কেমন গূঢ় বিজ্ঞান প্রকাশিত করেছি, তা পাঠক এই **বেদ-বিজ্ঞান আলোক** গ্রন্থের সম্পূর্ণ অধ্যয়ন দ্বারা জেনে যাবে।

আমার (আচার্য্য অগ্নিব্রত জীর) আধ্যাত্মিক ভাষ্য -

{মাম্সম্= মন্যতে জ্ঞায়তেঽনেন তত্ মাম্সম্ (উ০ কো০ ৩|৬৪), মাম্সম্ পুরীষম্ (শ০ ৮|৭|৪|১৯), পুরীষম্= পুরীষম্ পৃণাতেঃ পূরয়তের্বা - নি০ ২|২২; সর্বত্রাঽভিব্যাপ্তম্ - ম০দ০য়০ভা০ ৩৮|২১; য়ত্ পুরীষম্ স ইন্দ্রঃ - শ০ ১০|৪|১|৭; স এষ প্রাণ এব য়ত্ পুরীষম্ - শ০ ৮|৭|৩|৬)}।

পদার্থঃ **(এতত্ বা স্বাদীয়ঃ)** যোগী পুরুষের নিকট পরমাত্মার আস্বাদনকারক এই পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যারজন্য জীব পরমাত্মার সঙ্গে সাযুজ্য থাকে, **(য়দধিগবম্ ক্ষীরম্ বা মাম্সম্ বা)** সে পদার্থটি যোগীর মন আদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে পদার্থটি কি, এর উত্তর হয় এই যে, সর্বত্র অভিব্যাপ্ত পরমৈশ্বর্য় সম্পন্ন ইন্দ্ররূপে পরমাত্মা হতে ঝরতে থাকা **"ওম্"** বা গায়ত্রী আদি বেদের ঋচাগুলোই হল সেই পদার্থ, যা যোগীর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে নিরন্তর স্রবিত হতে থাকে। যোগী সেই আনন্দময়ী ঋচাগুলোর রসাস্বাদন করতে থাকে, তখন সে পরমানন্দের অনুভব করতে থাকে। **(তদেব ন অশ্নীয়াত্)** যোগী সেই ঋচার আনন্দকে ততক্ষন পর্যন্ত অনুভব করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অতিথিরূপ প্রাণ তত্ব, যা যোগীর মস্তিষ্ক ও শরীরে সতত সঞ্চারিত হয়, সেই ঋচার সঙ্গে সঙ্গত না হয়। এখানে অতিথি হতে পূর্বের প্রকরণ পূর্ববত্ বুঝে নিবেন।

ভাবার্থ - যখন কোনো য়োগী য়োগসাধনা করে আর এতদর্থ প্রণব বা গায়ত্রী আদির নিরন্তর জপ করে, তখন সর্বত্র অভিব্যাপ্ত পরমৈশ্বর্য়বান্ ইন্দ্ররূপ ঈশ্বর হতে নিরন্তর প্রবাহিত "**ওম্**" রশ্মির সেই য়োগীর অন্তঃকরণ তথা প্রাণের ভিতর স্রবিত হতে থাকে। এরফলে সেই য়োগী ঐ রশ্মির রসস্বাদন করার সঙ্গে আনন্দে নিমগ্ন হয়ে যায়।

(বেদবিজ্ঞান - আলোকঃ পূর্ব পীঠিকা হতে উদ্ধৃত)

আমি এখানে বেদেরই দুই বচনকে উদ্ধৃত করছি -

আশ্বাঃ কণাঃ গাবস্তণ্ডুলাঃ।

(অথর্ববেদ ১১|৩|৫)

শ্যামময়োঽস্য মাম্সানি লোহিতমস্য লোহিতম্।।

(অথর্ববেদ ১১|৩|৭)

এর সোজা অনুবাদ হবে যে, কণাই হল অশ্ব আর গৌ হল চাল। চালের শ্যাম ভাগই হল মাংস, যেটা লাল অংশ আছে, সেটাই হল হল রক্ত। এখন ফারুক জী! বলুন, এরকম অশ্ব ও গৌয়ের ভক্ষণকে আমরা বিরোধ কোথায় করবো? বস্তুতঃ এটির অর্থ তা নয়, যা এখানে অনুবাদে দর্শানো হয়েছে, বরং এরও তিন প্রকারের গম্ভীর অর্থ করা যেতে পারে, যেমনটা আমি পূর্ব মন্ত্রে দর্শীয়েছি। বিস্তারভয়ের জন্য আমি এখানে তা করছি না।

এখন আপনি বোঝা উচিত যে বেদে রূঢ় অর্থ হয় না বরং শব্দের যথাপ্রসঙ্গ যৌগিক ও য়োগরূপ অর্থ হয়ে থাকে। দেখুন, যে অথর্ববেদে আপনি গোমাংস খাওয়া ও পরিবেশনের কথা বলেছেন, সেই অথর্ববেদ বলছে-

য়দি নো গাম্ হম্সি য়দ্যশ্বম্ য়দি পুরুষম্।
তম্ ত্বাম্ সীসেন বিধ্যামো।

(অথর্ববেদ ১|১৬|৪)

অর্থাৎ - তুমি যদি আমাদের গাভী, ঘোড়া বা মনুষ্যকে মারো, তবে আমি তোমাকে সীসে দিয়ে ছেদ করে দিবো।

মা নো হিম্সিষ্ট দ্বিপদো মা চতুষ্পদ দঃ।

(অথর্ববেদ ১১|২|১)

অর্থাৎ - আমাদের মনুষ্য আর পশুদের নষ্ট করো না।

এখন অন্যত্র বেদে দেখুন -

ইমম্ মা হিম্সীর্দ্বিপাদ পশুম্।

(যজুর্বেদ ১৩|৪৭)

অর্থাৎ - এই দুই খুরওয়ালা পশুর হিংসা করো না।

ইমম্ মা হিম্সীরেকশফম্ পশুম্।

(যজুর্বেদ ১৩|৪৮)

অর্থাৎ - এই এক খুরওয়ালা পশুর হিংসা করো না।

য়জমানস্য পশুন্ পাহি।

(যজুর্বেদ ১|১)

অর্থাৎ - য়জমান পশুদের রক্ষা করো।

এখন আপনি বলতে পারেন য়জমান বা কোনো মনুষ্য বিশেষের পালিত পশুর হবে না কি সকল প্রাণীদের। এই ভ্রমের নিবারণার্থ অন্য প্রমাণ -

মিত্রস্যাহম্ চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।

(যজুর্বেদ ৩৬|১৮)

অর্থাৎ - আমি সকল প্রাণীদের মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি।

মা হিম্সী স্তন্বা প্রজাঃ।

(যজুর্বেদ ১২|৩২)

অর্থাৎ - এই শরীর দ্বারা প্রাণীদের মেরো না।

মা স্ত্রেত

(ঋগ্বেদ ৭|৩২|৯)

অর্থাৎ - হিংসা করো না।

বন্ধুবর! আপনিও কি বেদে হিংসার প্রমাণ দিবেন? আপনি ছল করায় বড় নিপুণ, এটা স্থানে স্থানে প্রতিত হচ্ছে। আপনি "**অঘ্ন্যা**" শব্দের উপর চর্চা করে লিখেছেন যে এটা কোনো গাভী বিশেষের জন্য, না কি সমস্ত গৌ জাতীর জন্য। এরজন্য ঋগ্বেদের এক মন্ত্রার্থকে উদ্ধৃত করেন, ছলের মহারথের প্রমাণ। "অঘ্ন্যা" শব্দটি হল যজুর্বেদ (১|১) মন্ত্রে, একে জুড়ে দিলেন ঋগ্বেদের একটার সঙ্গে। হল না কোথাকার ইট, কোথাকার রোড়া - যে ঋক্ মন্ত্রার্থের ঠিকানা (১|১৪৬|২৭) দিয়েছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করছি বিশ্বের যেকোনো গ্রন্থালয়ে এই স্থানের মন্ত্র দেখান। আপনার জানা উচিত যে (ঋগ্বেদ ১|১৪৬) তে মোট ৫টি মন্ত্রই আছে, তাহলে ২৭তম

কথা থেকে এলো? তাহলে এই নকলের তীরও ব্যর্থ গেলো। আপনি (ঋগ্বেদ ১০|৮৫) এর ৯৩ তম মন্ত্রে বিয়েতে মাংস পরিবেশনের বিবরণ লিখেছেন। এখানেও নকলে অসফল। এই সূক্তে মোট ৪৮টাই মন্ত্র রয়েছে, তাহলে ৯৩ তম মন্ত্র কোথা থেকে আনলেন? এই ৪৮ টি মন্ত্রতেও কোথাও মাংস পরিবেশনের চর্চা নেই। তবে হ্যাঁ, গোভক্ষকদের তথা এমন অনর্থ কারীদের কড়া থাপ্পড় অবশ্য লাগিয়েছে। যেখানে "**ঋক্**" আর "**সাম্**" রূপী বেদের ঋচাদের গৌ বলেছে, তাহলে খান এই গৌদের, কল্যাণ হয়ে যাবে, জীবন ধন্য হয়ে যাবে। যখন ঋগ্বেদ ও সামবেদের পবিত্র ঋচার পান করবেন, তখন তো গোমাংস পরিবেশন করা সারা জীবনের জন্য ভুলে যাবেন। আপনি যে (ঋগ্বেদ ১০|৮৫|১৩) এর কথা বলছেন, এর দেবতা হল সূর্য বিবাহ অর্থাৎ অলঙ্কারিক রূপে ঊষার বিবাহ, যেখানে "**গাবঃ**" এর অর্থ সূর্যের কিরণ হবে, না কি গাভী। ঊষা কাল ও সূর্যের সঙ্গে গাভীর কি সম্বন্ধ? এই কিরণ মাঘ মাসে মরে যায় অর্থাৎ আবছা হয়ে যায়, এই হল তার তাৎপর্য। যদি একে বধূ অর্থ মানা হয়, তবে "**হন্**" ধাতুর অর্থ মানা নয় বরং প্রাপ্ত করা হবে। দুঃখের বিষয় এটা যে, মাংসভোগী ক্রুরতা পছন্দ লোকেরা "হন্" এর অর্থ মারা-কেই নেয়, কিন্তু অন্যদিকে এটা ধাতু "প্রাপ্ত করার" অর্থেই প্রযুক্ত হচ্ছে। যদি আপনি হন্ এর অর্থ মারাই সর্বত্র করেন, তবে -

য়থাঙ্গা বর্ধতা শেপস্তেন য়োষিতামিজ্জহি।

(অথর্ববেদ ৬|১০১|১)

এর অর্থ আপনি এটা করবেন যে হে পতি! তুমি বীর্য সম্পন্ন হয়ে নিজের পত্নীকে মেরে ফেল, তখন নিশ্চয়ই এটা মূর্খতার প্রমাণ হবে। তখন "**জহি**" -র অর্থ "**জা**" এমনটাই করতে হবে অর্থাৎ পত্নীর নিকট যাও। এই অর্থ সুসঙ্গত হবে। প্রায়ঃ বিদ্বান "**গোঘ্ন**" শব্দকে পাণিনি অষ্টকের প্রমাণের সঙ্গে সম্প্রদানে প্রয়োগ করে, যে অতিথির জন্য গাভী মারা যাবে, তাকে গোঘ্ন বলে দেয়। এখানেও তাদের হন্ এর অর্থ কেবল মারাই মাথায় আসে। কি করবে, বেচারা জিভ ও মজহব উভয়েরই দাস। আমি জিজ্ঞেস করছি যে, গোঘ্ন শব্দের সঙ্গে অনুরূপ শব্দ হস্তঘ্নও রয়েছে, যা হাতের দস্তানার (Gloves) জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহলে হস্তঘ্ন এর অর্থ মিথ্যা হল, তখন এখানে হন্ এর অর্থ "প্রাপ্ত করা"ই নিতে হবে। এইজন্য বেদের অর্থ প্রকরণানুকূল তথা বেদের মূল ভাবনাকে ধ্যানে রেখেই নেওয়া যোগ্য হবে, না কি নিজের-নিজের রুচি ও মতির অনুসারে। বেদে "**গোঘ্ন**" শব্দ গোঘাতকের জন্যই এসেছে, সেখানে সেই গোঘ্ন হতে দূরে থাকারই উপদেশ রয়েছে, না কি তাকে অতিথি বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদ ১|১১৪|১০ বলছে -

আরে তে গোঘ্নমুত পুরুষঘ্নম্।

অর্থাৎ- গোঘাতক ও নরঘাতক তোমার থেকে দূরে থাকুক।

আমরা আর্যগণ বেদকেই স্বতঃ এবং পরম প্রমাণ মানি, অন্য গ্রন্থের মধ্যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ, মনুস্মৃতি, দর্শনশাস্ত্র, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা ও সত্যার্থ প্রকাশ আদিকে পরতঃ প্রমাণ মানি। বেদে হিংসার আপনার আক্ষেপের উত্তর আমি দিয়েছি, এখন অন্য প্রমাণ আমাদের মান্য নয়। আমাদের দৃঢ় মান্যতা হল যে, বেদ সংহিতাগুলোর ভাষ্যে অনেক ভাষ্যকার মিথ্যা অর্থ করেছে, অন্যদিকে অন্য পরতঃ প্রামাণিক গ্রন্থে কোথাও অনর্থ রয়েছে, আবার কোথাও প্রক্ষেপ। অনর্থকে শুদ্ধ করার পরেও কোথাও-কোথাও মাংসাহার সমর্থক প্রকরণ রয়ে যায়, যা বেদ বিরুদ্ধ হওয়ায় অমান্য, তাকে সরানোর জন্য সাহসিক কার্য মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী এবং তার অনুযায়ী আর্য বিদ্বানগণ করেছে ও করেও চলেছে। ১৮টি প্রচলিত পুরাণগুলোকে আমরা অপ্রমাণিত মানি, যার ওকালতি করা আমি না তো স্বীকার করি আর না আবশ্যক মনে করি। এই গ্রন্থগুলো হল মধ্যকালীন পণ্ডিতদের রচনা। এমনও স্পষ্ট আছে যে কোনো পুরাণ একই ব্যক্তির রচনা নয়। সময়ে-সময়ে জোড়-তোড় চলতে থাকে তথা চতুরাই পূর্বক সেটা ভগবান্ বেদব্যাস জী দ্বারা রচিত সিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে ও করা হচ্ছে। এই কুগ্রন্থগুলো (যদিও এরমধ্যে অনেক কথাই অতি উপযোগী ও সত্যও রয়েছে) -কে প্রমাণ মেনে বুকে জড়িয়ে রাখা, হিন্দুদের দুর্ভাগ্য। এখন একটু ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মাংসাদি স্বরূপের উপর দৃষ্টি দিন-

য়দা পিষ্টান্যথ লোমানি ভবন্তি।
য়দাপ আনয়তি অথ ত্বগ্ভবতি।
য়দা স য়ৌত্য থ মান্সম্ ভবতি।
(বৈদিক সম্পত্তি হতে উদ্ধৃত পৃষ্ঠ ৫২৭)

অর্থাৎ - আটার সংজ্ঞা হল লোম, জল মেশানো আটার চর্ম তথা বেলে রাখা আটার সংজ্ঞাই হল মাংস। এখন আপনিই ভাবুন যে আমরা এইরকম মাংস ভক্ষণের বিরোধও কোথায় করতে পারি? এই প্রকারের বিবরণ ঐত্রেয় ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায় -

তস্য য়ানি কিম্শারূপি তানি রোমাণি,
য়ে তুষাঃ সা ত্বগ্যে ফলীকরণাস্তদসৃগ্যত্পিষ্টম্
কিক্লসাস্তন্মান্সম্ য়ত্কিম্চিত্কম্ সারম্ তদস্থি।। ইত্তি।

এটির ভাষ্য আচার্য সায়ণ এই প্রকার করেছেন -

তস্য ব্রীহিবীজস্য সম্বন্ধীনি য়ানি কিম্শারুণি বুসপলালাদীনি তানি পশুরোমস্থানীয়ানি য়ে তুষাস্তণ্ডুলবেষ্টনরূপাঃ প্রথমাবঘাতেন পরিত্যাজ্যাঃ সা তুষসমষ্টিঃ পশুত্বকস্থানীয়া, য়ে ফলীকরণাস্তণ্ডুলশ্বৈত্যার্থেনাবঘাতেন হেয়া অম্শাস্তত্সর্বমসৃকপশুরক্তস্থানীয়ম্। য়ত্পিষ্টম্ তণ্ডুলপেষণেন নিষ্পন্নম্ পিণ্ডয়োগ্যম্ রূপম্ য়ে চ কিক্লসাঃ সূক্ষ্মাঃ পিষ্টাবয়বাস্তত্সর্বম্ পশুমান্সস্থানীয়ম্। য়ত্কিম্চিকম্ সারম্ স্বার্থে কপ্রত্যয়ঃ কিম্চিদন্যদ্ব্রীহিসম্বন্ধিকাঠিন্যরূপম্ সারম্ তদস্থি তত্পশোরস্থিস্থানীয়ম্। এবম্ পশুসাভ্যাত্ পুরোডাশস্য উস পশুত্বম্।।

ডা০ সুধাকর মালবীয়ার হিন্দি অনুবাদ -
সেই ব্রীহির যে (কিম্শারু অর্থাৎ) ভূঁসী রয়েছে সেটা পশুর লোমের স্থানীয়। যে তুষ (প্রথম অবঘাত দ্বারা বের হওয়া চালের বেষ্টন রূপ ভূঁসী) রয়েছে তা পশুর ত্বচা স্থানীয়, যে ফলীকরণ (তণ্ডুলকে শ্বেত করার জন্য যে অবঘাত দ্বারা বের হওয়া হেয়াংশ) রয়েছে, সেটা পশুর রুধির স্থানীয়। যা পিসা অবয়ব আর কিনকী রয়েছে সেটায় পশুর মাংস স্থানীয় রয়েছে আর যা কিছু অবশিষ্ট ব্রীহির কঠিন ভাগ রয়েছে সেটা হল পশুর অস্তি রূপ।

যদিও তাঁর ভাষ্য প্রমাণিক নয় তবুও এখানে ইনিও মাংসপরক অর্থ করেননি।

এটির উপর আমার (আচার্য অগ্নিব্রত জীর) ভাষ্য -
{কিম্শারুঃ= কিম্ শৃণাত্যনেনেতি কিম্শারুঃ (উ০কো০ ১|৪)। রোমাণি= লোমাণি (ম০দ০ঋ০ভা০ ১|১৩৫|৬), (লোম= লূয়তে ছিদ্যতে তত্ লোম - উ০কো০ ৪|১৫|২; ছন্দাম্সি বৈ লোমানি - শ০ ৬|৪|১|৬)। কিক্নসাঃ= সূক্ষ্মাঃ (আচার্য সায়ণ ভাষ্য)। মাম্সম্= মনোঽস্মিন্ সীদতীতি বা (নি০ ৪|৩), মাম্সম্ বৈ পুরীষম্ (শ০ ৮|৬|২|১৪), মাম্সম্ সাদনম্ (শ০ ৮|১|৪|৫)। রোম= রৌতি শব্দয়তীতি রোম (উ০কো০ ৪|১৫২)}
সেই পদার্থে বিদ্যমান {কিম্শারুঃ= কিম্ কিম্চিত্ কুত্সিতম্ বা শৃণাতীতি (ইতি মে মতম্)} শক্তিমান আর তেজস্বী বিকিরণের মধ্য হতে যা তীব্র ভেদকক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে, তাকেই কিম্শারু বলা হয়। এইজন্য নিঘণ্টুকার বলেছে "কুত্সঃ বজ্রনাম" - নিঘ০ ২|২০। এরকম তীব্র বিকিরণ বিবিধ ধ্বনি উৎপন্ন করতে থাকে আর এই বিকিরণ ছন্দ রশ্মির রূপে হয়। এই রশ্মি বিভিন্ন পদার্থকে তীব্রতার সঙ্গে কাটতে থাকে আর যে অপ্রকাশিত বাধক পদার্থ আকাশ তত্ত্বে মিলে তীক্ষ্ণতারহিত হয়ে পরিতৃপ্তের মতো হয়ে যায়, সেটি সব প্রকারের কণার ত্বচার তুল্য হয়ে যায় অর্থাৎ সেটি সব কণাকে আচ্ছাদিত করে রাখে। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই আছে যে, সেই আচ্ছাদিত কারক অপ্রকাশিত বাধক পদার্থ ওই কণাগুলোকে আচ্ছাদিত করেও কোনো প্রকার সংযোগ প্রক্রিয়ায় বাধক হয় না। এইসব প্রক্রিয়ায় যে তত্ব ছেদন-ভেদন ও সংযোজনের মূল প্রবর্তক রয়েছে, সেটা মন আর বাক্ -এর মিথুন এইসব তত্ত্বের অপেক্ষায় অসৃজিতই বলা হয়। এই তত্ত্বের মিথুন অন্য সৃজিত তত্ত্বের অপেক্ষায় পূর্ণ হয়ে থাকে আর সেই পূর্ণ তত্ব এইসব তত্ত্বের নির্মাণ আর বিনাশের প্রক্রিয়ায় সর্বশক্তিমতী চেতন সত্তার মূল প্রেরণা দ্বারা চলতে থাকে। এই তত্ত্বের মধ্যে যা যত সূক্ষ্ম হয়, তা ততই মন আর বাক্ -এর মিথুন হতে সংসিক্ত হয়ে থাকে, যার কারণে তা ততই বলশালী হয়ে থাকে। সে সূক্ষ্ম পদার্থই হল নিজের থেকে স্থূল পদার্থের আঁধার আর নিবাস স্থান রূপ। সকল স্থূল পদার্থের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম পদার্থেরই বল কার্য করে আর সেই পদার্থের মধ্যে যে সারভূত তত্ব রয়েছে, সেটা হল অস্থি রূপ। এখানে "সারম্" শব্দ "সৃ গতৌ" ধাতু হতে নিষ্পন্ন। এর আশয় হল যে, সেই সূক্ষ্ম পদার্থ পূর্ব পদার্থ থেকেও অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে, যা সকল পদার্থকে নিজের বল দ্বারা ধারণ করে রাখে। এই পদার্থ বিভিন্ন পদার্থকে এদিক-ওদিক প্রক্ষিপ্ত করতেও সমর্থ। আমাদের মতে এই পদার্থ মন আর বাক্ তত্ব দ্বারাই নির্মিত।।

এখন দেখুন, বেদাদিশাস্ত্রে মাংসাহারের ভ্রান্তি কিভাবে হয়, যারা বেদাদিশাস্ত্রের বিজ্ঞানকে জানে না, তারা **"মাংস"** শব্দ আসলেই যেন মাংসাহারের প্রমাণপত্র পেয়ে গেছে এরকমটা ভাবে, যদিও এই স্থানগুলোতে রূঢ়ার্থ দ্বারাও মাংসাহারের সিদ্ধি হয় না।

এছাড়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আমি যা বৈজ্ঞানিক ভাষ্য করেছি, এই ভাষ্য **"বেদবিজ্ঞান -আলোকঃ"** নামক চার ভাগে মোট ২৮০০ পৃষ্ঠার বিশাল গ্রন্থ রূপে আছে। এই গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক ভাষ্য বিশ্বে প্রথমবার আমিই করেছি। এই গ্রন্থ বর্তমান বিশ্বের মহান্ বৌদ্ধিক সম্পদার রূপ মানা যেতে পারে। যা থেকে অপ্রত্যাশিত ও গম্ভীর বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকট হচ্ছে। যে স্থানগুলোতে এখন পর্যন্ত আর্য সমাজেত্তর ভাষ্যকারদের হিংসা, মাংসাহার দেখা যেত তথা আর্য বিদ্বানদেরও সামান্য স্তরের কথাই দেখেছে, সেখানে আমি সেই সব প্রকরণের মধ্যে এস্ট্রোফিজিক্স, কোস্মোলজি, পরমাণু, নাভিকীয় ও কণ ভৌতিকীর অনেক গূঢ় তথা বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারাও অবিজ্ঞাত রহস্য খুঁজেছি। যেদিন আমার বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ গ্রন্থের বিজ্ঞানের বিশ্বের মধ্যে ব্যাপক প্রচার হবে, সেইদিন সম্পূর্ণ বিশ্বে ভৌতিক বিজ্ঞানে এক নূতন ও অভূতপূর্ব ক্রান্তি এসে বেদের ও ঋষিদের সম্পূর্ণ ভূতলের উপর প্রতিষ্ঠা হবে, এমনটা আমার বিশ্বাস। শ্রী ফারুক সাহেবের মতো মোটা মাথাওয়ালা মাংসভোজী কি জানবে, সেই দিব্য বৈদিক ও বিজ্ঞানকে? তাকে তো বেদভক্ত হিন্দুই বুঝতে পারছে না।

আপনি মহাভারতের কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। আমি পুনঃ নিবেদন করছি যে, বেদেতর প্রায় সকল গ্রন্থ প্রক্ষেপকর্থা ধূর্তদের ধূর্ততার শিকার হয়ে এসেছে। মহাশয় জী! মহাভারতে প্রায় ৯৫ শতাংশ প্রক্ষেপ রয়েছে, তাহলে যদি সেখানে হিংসা সমর্থক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়, এতে আশ্চর্যের কি আছে? আমি মহাভারতের কিছু প্রমাণ দিচ্ছি, দেখুন -

য়ঃ স্যাদহিম্সাসম্পৃক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়।

(শান্তিপর্ব অ০ ১০০|১২)

অর্থাৎ - যেটা অহিংসায় যুক্ত হবে, সেটা নিশ্চয়ই ধর্ম হবে।

অহিম্সা সর্বভূতেস্যো ধর্মেভ্যো জ্যায়সীনতা।।

(শান্তিপর্ব অ০ ২৬৫|৬)

অর্থাৎ - সমস্ত প্রাণীদের জন্য অহিংসাই হল সবার বড়।

সুরা মত্স্যা মধু মাম্সমাসবম্ কৃষরৌদনম্।
ধূর্তঃ প্রবর্তিত হয়েতন্নৈতদ্ বেদেষু কল্পিতম্।

(শান্তিপর্ব অ০ ২৬৫|৯)

অহিংসা সকলো ধর্মঃ।

(শান্তিপর্ব অ০ ২৭২|২০)

অর্থাৎ - মদ্য, মাংস আদির যজ্ঞে আহুতি দেওয়াটা হল বেদ বিরুদ্ধ তথা এটা ধূর্তদের দ্বারা চালানো হয়েছে। অহিংসাই হল সম্পূর্ণ ধর্ম।

বীজৈর্য়জ্ঞেষু য়ষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ।
অজ সম্জ্ঞানি বীজানি চ্ছাগ নো হন্তমর্হথ।
নৈষ ধর্মঃ সতাম্ দেবা য়ত্র বধ্যেত বৈ পশুঃ॥

(শান্তিপর্ব অ০ ৩৩৭|৪,৫)

অর্থাৎ - যজ্ঞ বীজ (অন্ন আদি) দ্বারা করা উচিত, এটাই হল বৈদিক বিধান। এই বীজগুলোকে অজ বলা হয়। ছাগ (ছাগল) মারা উচিত নয়। যেখানে পশুবধ হবে, সেটা বিদ্বানদের ধর্ম নয়। মহাভারতে অনেকত্র অহিংসা পরমোধর্মের ঘোষণা রয়েছে। পিতামহ ভীষ্মের উপদেশের মধ্যে মাংসাহারের প্রচণ্ড নিন্দা বিস্তারে করা হয়েছে। এতেও যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তবে মহাভারতের অনুশাসন পর্ব স্বয়ংই পড়ে নিবেন। তবুও যদি কেউ বেদ ও বৈদিক আর্যদের মধ্যে মাংসাহারের প্রমাণ খোঁজে, তাকে পাগলই বলা যেতে পারে।
হ্যাঁ, আমি মানছি যে, অনেক আর্ষ গ্রন্থে মাংসাহারী লোকেরা নিজের-নিজের দূষিত বিচার সময়ে-সময়ে এর মধ্যে প্রক্ষেপ করেছে, যাকে সাবধানী পূর্বক নিষ্পক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে বিদ্বানগণ দূর করতে পারে।
এখন **আপনার কথন হল** -
"স্বামী দয়ানন্দ বলেন যে, যেখানে গোমেধ আদি যজ্ঞ লেখা আছে, সেখানে পশুদের মধ্যে নর পশুদের মাংস লেখা আছে, কারণ হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড় আদি হল নর পশু। এই প্রকারের যে গাভী হয় না, তাকেও গোমেধে মারা লেখা আছে।" (সত্যার্থ প্রকাশ পৃষ্ঠ ৩০৩ সন ১৮৭৫, দয়ানন্দ ভাব চিত্রাবলী পৃ০ ২৮)

সমীক্ষা - মনে হচ্ছে যে আপনি সত্যার্থ প্রকাশ পড়া তো দূর, দেখেন নি পর্যন্ত। আপনি দয়ানন্দ ভাব চিত্রাবলী দ্বারা উদাহরণ দেখেই লিখে দিয়েছেন। আজ সম্পূর্ণ আর্য জগতের মধ্যে যেখান থেকেই হোক সত্যার্থ প্রকাশ নিয়ে এসে পড়ে নিবেন, তারপর দোষারোপণ করবেন, তাহলেই উচিত হবে। হ্যাঁ,আমার এটা স্বীকার করতে কোনো সঙ্কোচ নেই যে, সত্যার্থ প্রকাশের প্রথম সংস্করণের মধ্যে মাংসাহার এবং শ্রাদ্ধ আদি অবৈদিক ও পাপপূর্ণ মান্যতা ধূর্ত লেখকরা লিখে দিয়ে ছিল। ঋষিবর স্বয়ং না লিখে, বলে লেখাতেন। অতি ব্যস্ততাবশ নিজের বিশ্বস্তোদের উপর কার্যভার ছেড়ে দেওয়ায় এরকম আপত্তিজনক কথা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যাকে স্বয়ং ঋষি নিজের জীবনকালে বের করে দিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ তৈরি করেছিলেন। এই সংস্করণ ঋষির জীবনকালের পশ্চাৎই ছাপা হয়। প্রথম সংস্করণ রাজা জয়কৃষ্ণদাসের দেখাশোনাতেই হয়েছিল, যেখানে উপর্যুক্ত মিথ্যা কথা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে ১৩ ও ১৪ সমুল্লাসও ছাপা হয়নি। এই

সংস্করণের ভুলের বিষয়ে ঋষি বিক্রমী সম্বত্ ১৯৩৫ শে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ছিলেন। একবার তাঁর ভক্ত ডা০ মুকন্দসিংহ, রইস, ছলেসর, অলীগড় নিবাসী এক পত্র দ্বারা নিবেদন করে -
"আমি পার্বণ শ্রাদ্ধ করতে চাই, এর জন্য পাঁঠাও তৈরি আছে। আপনিই এই শ্রাদ্ধটি করিয়ে দিন।"
এর উত্তরে মহর্ষি জী বনারস থেকে লিখেন -
"এই সংস্করণ রাজা জয়কৃষ্ণদাস দ্বারা মুদ্রিত হয়েছে। এখানে অনেকগুলো অশুদ্ধি রয়েগেছে। শাকে ১৭৯৬ তে আমি যে পঞ্চমহায়জ্ঞ বিধি প্রকাশিত করেছিলাম, যা রাজাজীর সত্যার্থ প্রকাশের এক বর্ষ পূর্বে ছাপা হয়েছিল, ওখানেই মৃতক শ্রাদ্ধ আদির খণ্ডন রয়েছে, তাহলে সত্যার্থ প্রকাশে মণ্ডন কিভাবে হতে পারে? অতএব শ্রাদ্ধ বিষয়ে, যে মৃতক শ্রাদ্ধ আর মাংস বিধানের বর্ণন রয়েছে, সেটা বেদ বিরুদ্ধ হওয়ায় ত্যাজ্য হবে।

যখন কোনো গ্রন্থের লেখক স্বয়ং নিজের গ্রন্থে থাকা ভুলের ও দুষ্টের তত্ব দ্বারা জেনেবুঝে করে থাকা মিশ্রণকে অমান্য ও আপত্তিজনক ঘোষণা করছেন, তারপরেও যদি কোনো ব্যক্তি সেই কথাগুলোকে ধরে এনে উদাহরণ দেয় ১২৫ বর্ষ পশ্চাৎও জারি রাখে, তখন তাকে কি বলা হবে, এটা আপনিই বিচার করে বলে দিবেন। বিজ্ঞ ও নিষ্পক্ষ পাঠক স্বয়ংই বিচার করে নিবে।

ফারুক জী! আপনি একবার নিজের মাংসাহার সমর্থক হঠকে ত্যাগ করে প্রাণীমাত্রের হিতৈষী মহান বৈদিক ধর্মের মহান সংশোধক ভগবান্ দয়ানন্দ জী মহারাজের হৃদয়ের ভাব তথা মহান মেধাবী মস্তিষ্ককে জানার চেষ্টা করুন। যে সত্যার্থ প্রকাশের উপর আপনি মিথ্যা আরোপ লাগিয়েছেন, সেই গ্রন্থ মাংসাহারের বিষয়ে কি বলে, একটু দেখুন -
১. ‘‘মদ্যমাংসাহারী ম্লেচ্ছ, যার শরীর মদ্যমাংসে পরমাণুর দ্বারাই পরিপূর্ণ, তার হাতে খাবে না।’’
২. ‘‘এই পশুদের হত্যাকারীরা সব মানুষ্যের হত্যাকারী জানবে।’’
৩. ‘‘যখন থেকে বিদেশী মাংসাহারী এই দেশে এসে গাভী আদি পশুদের হত্যাকারী মদ্যপায়ী রাজ্যাধিকারী হয়, তখন থেকে ক্রমশঃ আর্যদের দুঃখের সীমা বাড়তে থাকে।’’

(সত্যার্থ প্রকাশ - দশম সমুল্লাস)

দেখুন দয়ার সাগর ঋষি দয়ানন্দ কি বলেছেন -
১. ‘‘পশুদের গলায় ছুরি দিয়ে কেটে, যারা নিজের পেট ভরে, তারা সারা বিশ্বের ক্ষতি করছে। বিশ্বের মধ্যে তাদের থেকেও অধিক কোনো বিশ্বাসঘাতক, অনুপকারী, দুঃখ দায়ী পাপীজন আর আছে কি?"
২. ‘‘হে মাংসাহারীরা! যখন তোমরা কিছু সময় পশ্চাৎ পশু পাবে না, তখন মনুষ্যের মাংসকেও ছাড়বে কি?’’
৩. ‘‘হে ধার্মিকগণ! আপনারা এই পশুদের রক্ষা তন, মন আর ধন দ্বারা কেন করেন না?’’

(গোকরুণানিধি)

বন্ধুবর! বৈদিক ধর্ম কুরআনের মতো কেবল সম্প্রদায় বা ক্ষেত্র বিশেষেরই লাভের কথা বলে না, বরং প্রাণীমাত্রের কল্যাণেরই কামনা করে। দ্যুলোক, পৃথিবীলোক, মহাকাশ, জল, বায়ু, বনস্পতি, সকল প্রাণী আদির জন্য শান্তির প্রার্থনা করে। বিশ্বের কোনো মত মজহব এই ব্যাপকতা, সার্বকালিক্তার কথা বলে না, বরং কূয়োর ব্যাঙ হয়ে স্বার্থেরই কথা বলে। আমাদের এখানে বলিবৈশ্বদেব নামক এক মহাযজ্ঞ সনাতন থেকে প্রচলিত আছে, যেখানে কীট, পক্ষী, পশু, ক্ষুধার্ত রোগী, অসহায় মনুষ্য, কুকুর, কাক, গাভী আদির জন্য প্রতিদিন ভোজন দেওয়ার বিধান রয়েছে আর এমনটা কর্মের কর্তা আর্য জাতি কিভাবে নিজের স্বাদের রূচির জন্য কোনো প্রাণীর গলা কাটার পাপ করতে পারে? হ্যাঁ, এই সর্ব কল্যাণকারী ধর্মে ধূর্ত লোকেরা সময়ে-সময়ে দূষিত কথা মিশ্রণ করেছে, তাকে দূর করার চেষ্টা সর্বপ্রথম ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী জী করেছিলেন, তাঁরই কৃপায় আর্য সমাজ এই পুনীত কার্য করছে। বৈদিক ধর্ম বলে যে, সকল প্রাণীর মধ্যে আমাদের মতো জীবাত্মার নিবাস রয়েছে। সকলের আমাদের মতোই সুখ দুঃখ হয়। সব প্রাণী পরমাত্মার সন্তান হওয়ায় সকলে ভাই ভাই। যখন আমাদের গায়ে কোনো কাঁটাও হানে তখন লাফিয়ে উঠি, একটু ভাবুন! যখন আপনি কোনো পশুকে কাটছেন, তখন তার কতই না পীড়া হবে? বেচারা বিবশ হয়ে চটপট - চিৎকার করে প্রাণ ছেড়ে দেয় আর তাকে পাপী জন নিজের পেট ভরায়, যেমন - কুকুর, বিড়াল ও শেয়াল মৃত পশুকে চেটে ফেলে। একবার ভাবুন যে, কোন মাতা-পিতা হবে, যে নিজের বুদ্ধিমান সন্তানকে নির্দেশ দিবে যে তুমি নিজের মূর্খ ভাইদের মেরে খেয়ে ফেল আর এরকম কুকর্ম দেখে কোন মাতা-পিতা প্রসন্ন হবে? এরকম কখনও সম্ভব নয়, তাহলে যিনি সকলের মাতা-পিতা পরমেশ্বর হয়, তবে তিনি কিভাবে মাংসাহারীদের কুকর্ম দেখে প্রসন্ন হতে পারেন? হ্যাঁ, তিনি সেই পাপীদের পাপের শাস্তি অবশ্যই দিবেন। আশা করি আপনি ভাববেন যে, রহীম আল্লাহ সেই পশুদের জন্যও রহীম আছে, যাকে আপনি মেরে খাচ্ছেন। যদি বলেন যে, তারা তো একদিন এমনিতেই মরবে, তাহলে আমি বলবো, আপনি কি অমর? যদি না, তবে আপনি কি চাইবেন যে কেউ আপনাকে মেরে খাক, যদি না চান তবে পশুদের কেন মারবেন? রহীমের ভক্ত স্বয়ং রহীম হন, তবেই ইবাদত সফল হবে।

• মাংসাহার ও আয়ুর্বেদ •

যদি কেউ এখানে এটা বলে যে আয়ুর্বেদিক গ্রন্থের (চরক শাস্ত্র ও সুশ্রুত সংহিতার) মধ্যে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন পশু-পক্ষীদের খাওয়ার বিধান রয়েছে, তাহলে এটা (মাংসাহার) অধর্ম হল কিভাবে? এর উত্তরে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাইবো যে, আয়ুর্বেদ গ্রন্থের মধ্যে এই প্রকরণ বেদবিরুদ্ধ ও প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় আমাদের এটা মান্য নয়। ভাবুন, যেই ঋষিদের যোগ ও দৈনিক ব্যবহার অহিংসা দ্বারা প্রারম্ভ হয়, যারা সকলের সঙ্গে স্বাত্মবত্ ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়, সেই ঋষি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য কোনো প্রাণীকে

প্রাণহরণের কথা কিভাবে বলতে পারে? আবার যখন স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে মন ও আত্মা দ্বারাও হয়, তখন মন ও আত্মাকে দূষিত কারক মাংস আদি অভোক্ষ্য পদার্থকে কিভাবে স্বাস্থ্যবর্ধক বলা যেতে পারে? আবার পরমেশ্বরের বিজ্ঞান হল ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়েরই সমগ্ররূপ, তাহলে আয়ুর্বেদ কিভাবে এইরকম অধর্মের আজ্ঞা দিতে পারে? মাংসাহার এক রোগকে দূর করতে গিয়ে অন্য রোগ উৎপন্ন করে না? যদি হ্যাঁ হয়, তবে কিভাবে একে আয়ুর্বেদের ভাগ মানা যেতে পারে? যখন মাংসাহার ও হিংসা দ্বারা পূর্বোক্ত অনেক রোগ ও প্রাকৃতিক প্রকোপ হয়ে থাকে, তখন কিভাবে আমাদের মহান্ আচার্য এর অনুমতি দিতে পারে? বস্তুতঃ আয়ুর্বেদে দুর্ভাগ্য যে কিছু কামী ও মাংসাহারী লোকেরা কামোত্তেজক ঔষধের তথা মাংসাহারের প্রসঙ্গ মিশ্রিত করেছে, বিজ্ঞজনদের এইরকম প্রকরণ হতে দূরে থাকা উচিত। এরসঙ্গে আয়ুর্বেদের বিদ্বানদের এই প্রকরণের উপর গম্ভীতার সঙ্গে বিচার করে এইরকম প্রকরণগুলোকে গ্রন্থ থেকে বের করে দেওয়া উচিত।

যেতে-যেতে আপনার অন্তিম বাক্যের উপর সংক্ষিপ্ত সংকেত কিছু করে দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করি।
আপনার কথন হল -
"ইসলামের সবথেকে বড় গুণ হল যে, তার শিক্ষা প্রকৃতির অনুকূল। তার একটাও আদেশ এমন নয়, যাকে আমরা অবৈজ্ঞানিক বলতে পারি। তার জীবন দর্শনে কোথাও অপূর্ণতা অথবা অভাব নেই।

সমীক্ষা - আপনি মাংসাহারীর কথা বলতে-বলতে এটা মৌমাছির মৌচাকে হাত দিয়ে ফেলেছেন। কোথায় কুরআনের অবৈজ্ঞানিক, অসম্ভব গপ্প আর কোথায় বর্তমান বিজ্ঞানের উচ্চস্তরীয় সিদ্ধান্ত! একদম আকাশ পাতাল। "এই মুখ আর মসুর ডালের" এর প্রবাদ পূর্ণতঃ চরিতার্থ আপনার উপরেই হতে পারে। এই বিষয়ের উপর আলাদা করে এক পুস্তক লেখা যেতে পারে। এই নিবন্ধটি বিস্তৃত হয়ে গেছে আর এটা প্রসঙ্গ বিষয় হতে পৃথক্ও, এই কারণে এর উত্তর এখানে দেওয়া উচিত প্রতীত হচ্ছে না। তবুও আমার পরামর্শ হল যে আপনি একটু বিচার করে কুরআনের ভালোভাবে অধ্যয়ন করে আমার সঙ্গে চর্চা করতে পারেন। হ্যাঁ, এটা তো অবশ্যই বলবো যে খুদার কথন মাত্রতে সৃষ্টি-নির্মাণ, কোথাও ৬ দিন সবকিছুর নির্মাণ, কোথাও বা ভুলে ৮ দিন বলে দেওয়া, আকাশের চামড়া ধরে টানা, আকাশকে কাগজের মতো মুড়ে ফেলা, চাঁদের রক্তের মতো লাল হওয়া, আকাশে বুর্জ (মিনার/কেল্লা) হওয়া, তাকে সমতল করা আদি বৈজ্ঞানিক (?) তথ্যকে আপনাদের মাদার্সা যদিও পড়ায়, কিন্তু এগুলো পড়ে কেউ ভৌতিক, খগোল বা শরীর শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক হতে পারবে না। মসজিদে কিছু পড়া, বিদ্যালয় ও প্রয়োগশালায় আরএক পড়া এটা প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য না কেবল কুরআন বরং বাইবেল তথা পুরাণকে পঠনকারীর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। আশ্চর্য যে, এই গ্রন্থগুলোর মান্যকার নিজের-নিজের পূর্বাগ্রহ ও জিদকে ত্যাগের জন্য তৈরি হয় না।

পরমপিতা পরমাত্মার কৃপায় বিশ্বের সকল মত পন্থ কারী বিজ্ঞান বুদ্ধিকে রেখে নিষ্পক্ষতার সঙ্গে বিচার করে একমেব সত্য হিতকারী মার্গে চলে মানব একতার সঙ্গে সর্বপ্রাণীকল্যাণের মার্গ প্রশস্ত করুক। এই ভাবনা ও কামনার সঙ্গে, ওম্ শম্।।

- আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক

উল্লেখিত (reference) গ্রন্থ -

১. আর্য জগৎ ২ মে ২০০৪
২. আর্য জগৎ ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৯
৩. আমার আহার আমার স্বাস্থ্য - ডা০ নাগেন্দ্রকুমার নীরজ
৪. মাংস মানুষের ভোজন নয় - স্বামী ওমানন্দ সরস্বতী
৫. ঋগ্বেদ
৬. যজুর্বেদ
৭. অথর্ববেদ
৮. শতপথ ব্রাহ্মণ
৯. মহাভারত
১০. বাল্মীকি রামায়ণ
১১. সত্যার্থ প্রকাশ
১২. গোকরুণানিধি
১৩. রোগের নতুন চিকিৎসা - লুই কূনে
১৪. ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর গ্রন্থের ইতিহাস লেখক - পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক
১৫. বৈদিক সম্পত্তি - পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মা
১৬. বিজ্ঞান মাসিক পত্রিকা - ফেব্রুয়ারি ২০১০
১৭. বেদের যথার্থ স্বরূপ - পণ্ডিত ধর্মদেব বিদ্যা মার্তণ্ড
১৮. বেদবিজ্ঞান-আলোক - আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক

অনুবাদক - আশীষ আর্য

বিশ্বের সকল প্রবুদ্ধ ভাই ও বোনেরা!

একটু ভাবুন যে সৃষ্টির রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মা এই সংসারের মধ্যে ফল, দুধ, শাক, অন্ন, বাদাম, ঘৃত আদি সুন্দর, সরস ও স্বাস্থ্যবর্ধক পদার্থ খাওয়ার জন্য দিয়েছে। তাহলে কেন আমরা নির্দোষ নিরীহ জীবের প্রাণহরণের ভয়ংকর কষ্ট দিয়ে মাংস - মাছ তথা ভ্রূণরূপ ডিমের মতো নোংরা অভোক্ষ্য পদার্থের সেবন করছি? আমরা কি জানি না যে, এই পাপপূর্ণ আহারের কারণে না কেবল অনেক রোগের জন্ম হয়, তারসঙ্গে পরিবেশে সংকট উৎপন্ন হয়ে ভূকম্প, তুফান, ঘূর্ণি ঝর, খরা, বন্যা আদি প্রাকৃতিক প্রকপের মধ্যেও অধিক বৃদ্ধি হয়। হিংসা, ক্রোধ, শোক ও দুঃখের তরঙ্গ এই ব্রহ্মাণ্ডকে ভারসাম্যহীন করে বিশ্বে নানা অপরাধেরও জন্ম দেয়।

আসুন! ভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী যারা নিজেকে মানব বলে! উঠুন, জাগুন, ভাবুন আর নিজের বুদ্ধিমত্তার বাস্তবে পরিচয় দিয়ে শুদ্ধ শাকাহার ধারণ করুন আর এই পৃথিবীকে বিনাশের হাত থেকে বাঁচান। উঠুন, নির্দোষ - নিরীহ প্রাণীরা আপনার কাছে নিজের প্রাণের ভিক্ষা চাচ্ছে। তাদের জন্য নিজের হৃদয়ে দয়া, করুণা আর প্রেমকে জাগান।

- আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক

   /vaidicphysics

বৈদিক এবং আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞান শোধ সংস্থান

বেদ বিজ্ঞান মন্দির, ভাগলভীম, ভীনমাল জেলা - জলোর (রাজস্থান) পিন - ৩৪৩০২৯

Recent Development on Cosmology, BHU 2018
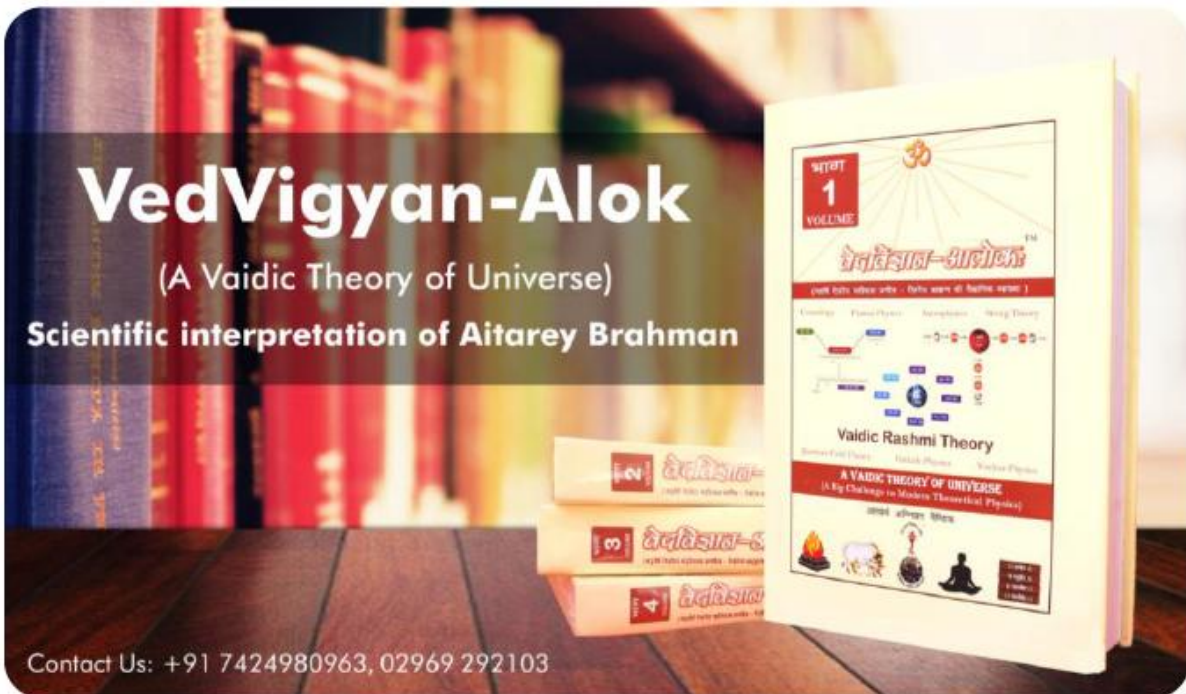
বিনম্র নিবেদন

মান্যবর! আপনি আচার্য জীর কার্য আর মহত্বকে ভালোভাবে বুঝে থাকবেন, এমনটা আশা করছি। যদি আপনার হৃদয় আর মস্তিষ্কে বেদের এই অপূর্ব কার্যের জন্য উৎসুক হয়ে থাকে আর নিজে আমাদের সহায়তা করতে চান তবে আপনি আমাদের যজ্ঞে নিম্ন প্রকার দ্বারা সহযোগী হতে পারেন -

Bank Name	**Punjab National Bank**
A/c Holder	Pramukh, Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas
A/c Number	4474000100005849
Branch	Bhinmal
IFS Code	PUNB0447400

অথবা

Bank Name	State Bank of India
A/c Holder	Pramukh, Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas
A/c Number	61001839825
Branch	Khari Road, Bhinmal
IFS Code	SBIN0031180

বিশেষ নিবেদন

এই কার্য অত্যন্ত পবিত্র, এই কারণে আচার্য শ্রীর ভাবনানুসার বিনম্র নিবেদন যে, **যার অজীবিকা কোনো প্রকারের হিংসা, চুরি, চোরাচালান, অশ্লীলতাবর্ধক সাধনে, নেশা জাতীয় বস্তুর বিক্রী, প্রতারণা, শোষণ আদির উপর নির্ভরশীল তথা যে নির্ধন ভাই নিজের সামর্থ্যের অধিক (অথবা নিজের পরিবারে ক্লেশ করে) দান করতে চান, এরকম মহানুভাবদের সদভাবনার ধন্যবাদ করেও আমরা তাদের দান নিতে অসমর্থ। দয়া করে এরকম করার প্রস্তাব করে আমাদের লজ্জিত করবেন না। হ্যাঁ, যে বন্ধু এরকম কর্মকে ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে জুড়তে চান, তবে তাদের হার্দিক স্বাগত হবে।**

Donations now accepted through BHIM/UPI also

UPI Address shrivspnyas@upi